নির্ম্মাল্য ।

দ্বি. ৬

নির্ম্মাল্য।

শ্রীবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য এক টাকা।

বসন্ত বোধন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

কলিকাতা, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
শ্রীরাম প্রেসে
শ্রীসারদাপ্রসাদ মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মুখবন্ধ।

ভীষণ কর্ম্ম-প্রবাহের দুজ্জ্ঞেয় ঘূর্ণাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইতে হইতে যে সঙ্কটস্থানে উপনীত হইয়াছি সেই স্থান হইতে আর একটু ঘূর্ণিত হইলেই আবর্ত্তের অতল তলে সমাহিত হইব। সম্মুখে অদূর সন্ধ্যার অস্পষ্ট আঁধার; পশ্চাতে দূর প্রভাতের অস্পষ্ট আলোক। এতাদৃশ সন্ধিক্ষণে প্রতি স্পন্দনেই প্রাণ সকাতরে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"কি খেলা হইল?" এই জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার জন্য জীবনের অতীত আলোচনা করিতে বসিয়া গত দশ বৎসরের স্মৃতি-চিহ্ন সংগ্রহ করিয়াছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে তখন প্রদীপ্ত যৌবন, দশ বৎসর পরে আজ দীপ্তিহীন বার্দ্ধক্য। এই দশ বৎসরের খেলাই খেলা। এই খেলার আলোচনা হইলেই "কি খেলা হইল?" এই প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে। এই দশ বৎসরের স্মৃতি-চিহ্নের কিয়দংশ রক্ষিত হইতেছে গুপ্ত দৈনন্দিন জীবন পত্রিকার পত্রে, আর কিয়দংশ ব্যক্ত হইয়াছে মাসিক পত্রের পত্রে। ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৩১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত যাহা বঙ্গের দুইখানি মাসিক পত্রে প্রধানতঃ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশই এই "নির্ম্মাল্যে"র উপাদান।

এই-স্মৃতি-চিহ্নের "নির্ম্মাল্য"—নাম করণ কেন হইল? এই প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া কঠিন। মুখবন্ধে বহু কথা বলিবার রীতিও নাই। সুতরাং সংক্ষেপেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইতেছে। আমার হৃদয়ের একজন দেবতা আছেন। কবে কেমনে যে তাঁহাকে হৃদয়সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছি তাহা ঠিক বলিতে পারি না—ইহজন্মে, কি পূর্ব্বজন্মে, কি জন্মজন্মান্তরে তাহা আজিও নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না। যাঁহাকে হৃদয়াসনে বসাইয়াছি তাঁহাকে লইয়া আমার এই জীবন-ব্যাপী বিপদ চলিতেছে। তিনি কখনও হাসেন—আমিও তখন হাসি। তিনি কখনও অভিমানে মুখ ভার করেন—আমিও তখন কাঁদি আর ভাবি। এই হাসি ও কান্নার কালে প্রাণে যে ভাব-কুসুম বিকসিত হইয়াছে সেই কুসুম এক একটি করিয়া সেই দেবতার চরণে অর্পণ করিয়াছি। নিবেদিত সেই পুষ্প সমূহের কয়েকটি লইয়া আজ এই মাল্য রচনা করিতেছি। দেবোপভুক্ত এই পুষ্পমাল্যের নাম তাই "নির্ম্মাল্য"—রাখিলাম।

যে পুষ্পে একদিন আমার প্রেম পাত্রের পূজা অর্চ্চনা করিয়াছি সেই পুষ্পের এই মালা আজ তাঁহার প্রসাদরূপে পথের পাথেয় করিয়া রাখিলাম। যদি আমারই ন্যায় কোনও কণ্টক-কঙ্কর-কাতর পথিকের এই নির্ম্মাল্যে কোনও উপকার হয়, ভালই—আর যদি কাহারও কোন

উপকার না হয়, ইহাতে আমার ভাল হইবেই। এই বার্দ্ধক্যে যখন হৃদয়ের ভাব ম্লান হইয়া উঠিবে তখন এই যৌবনের স্মৃতিতে—এই "নির্ম্মাল্যের" প্রেরণায় একটু উদ্দীপ্ত হইব। নির্ব্বীর্য্য বার্দ্ধক্যের তামস অবস্থায় প্রদীপ্ত যৌবনের বীর্য্য-চিন্তায় আবার একটু পুরুষকার করিতে উৎসাহিত হইব।

এই নির্ম্মাল্য-রচনার আর এক কারণ আছে। বাল্যে, কৈশোরে, এবং যৌবনে আমি "প্রজাপতি"র ন্যায় ছিলাম। নীল গগনতলে, প্রভাত সূর্য্যের আনন্দময় কিরণে, বিকচ কুসুমে প্রজাপতি যেমন তাহার বিচিত্র পক্ষ ঈষৎ কম্পিত করিতে করিতে হর্ষভরে খেলিয়া বেড়ায় আমিও সেইরূপ সুনীল গগনতলে, শ্যামল প্রান্তরে, প্রভাতে-সূর্য্যের কিরণ মাখিয়া বাল্য-সহচরগণের সহিত হাসিয়া খেলা করিতাম। আমার সহচর ও সহচরীগণ কেহ আদর করিয়া আমার নাম রাখিয়াছিলেন "প্রজাপতি", কেহ নাম রাখিয়াছিলেন "সুন্দর"। আমার পরম আদরের এই সখা ও সখীগণের কেহ কেহ ইতঃপূর্ব্বেই—যৌবনের হাসি ও আলোক অক্ষুণ্ণ থাকিতেই—চির হাসি ও চির আলোকের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আমারই ন্যায় এখনও এই ধরায় অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা যে যাহার পথ ধরিয়া জীবনে চলিতেছি—গত দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের জীবন ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। এখন

যখন আমার সহিত আমার সহচরগণের সাক্ষাৎ হয় তখন আমরা পরস্পরের প্রতি চাহিয়া আর বাল্যের সেই একতানতা অনুভব করিতে পারি না। তাঁহাদিগকে পাইয়া আমি আর সেই "প্রজাপতির" ন্যায় পক্ষ কম্পিত করিতে পারি না। আমাকে পাইয়া তাঁহারা আর সেই "সুন্দর" বলিয়া আদর করিতে পারেন না। কেহ কেহ স্পষ্টই আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কেন এমন হইল ?" আমি উত্তর করিতে পারি না—যাহা বলিবার তাহা বলিতে যাইয়া বলিতে পারি না। তাঁহারা উত্তর না পাইয়া ব্যথিত হয়েন। আমি তাঁহাদিগকে আজিও সেইরূপ ভালবাসি—তাঁহারা ব্যথিত হয়েন দেখিয়া আমিও ব্যথিত হই। দীর্ঘকাল আমরা এইরূপে ব্যথিত হইতেছি। আমি যাহা মুখে বলিতে পারি না তাহার কিছু আভাস এই স্মৃতি-চিহ্ন গুলিতে বিজড়িত আছে। মনে ভাবিতেছি এই "নির্ম্মাল্য" আমার সেই সৌহার্দ্দ-সুখ-সমুজ্জ্বল-জীবন-প্রভাতের মধুর সখা ও সখীবৃন্দের করকমলে অর্পণ করিব—যদি ইহাতে আমাদের সেই হাসিক্রীড়া-কৌতুক-সমুদ্দীপ্ত জীবনপ্রভাতের চিররমণীয় প্রণয় চির-সঞ্জীবিত রহে !

এই নির্ম্মাল্য-রচনার আরও কারণ আছে। সকল কথা সবিস্তারে বলিবার ইহা স্থান নহে। মর্ম্মকথা হইতেছে এই যে আমি এ যাবৎ যে সকল পূজ্যপাদ আচার্য্যগণের নিকট আমার পার্থিব শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাঁহাদের

অনেকেই চিরদিন মনে করিতেছেন যে আমি একদিন একজন লোক হইব। তাঁহারা যখন দেখেন যে আমি সংসারের কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করি না তখন তাঁহারা বিস্মিত হয়েন এবং বেদনা পান। তাঁহারা আমাকে অনেকবার উৎসাহিত করেন কিন্তু আমি পার্থিব বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করি না দেখিয়া তাঁহারা মর্ম্ম-পীড়ায় কাতর হয়েন। আমি মনে করিতেছি আমার এই "নির্ম্মাল্য" ভক্তিভরে তাঁহাদের করকমলে অর্পণ করিব। সকল বুঝিয়া হয়ত তাঁহারা আর বিমর্ষ হইবেন না।

এই "নির্ম্মাল্য" রচনার যে দুইটি কারণ উক্ত হইল এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি কারণ আছে। এই দুইটি কারণের একটি না বলিবার কারণ এই যে সেই কারণ প্রকাশ করিলে লোক হাসিবে কি না তাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। অন্য কারণটি গুপ্ত রাখিবার হেতু এই যে এই কারণটি ব্যক্ত করিবার অধি-কার যাঁহার হস্তে তিনি এই কারণটি ব্যক্ত করিতে বলি-তেছেন কিনা তাহা আজিও আমি সুনিশ্চিত ভাবে জানিতে পারি নাই। যদি কখনও তিনি বলিতে বলেন তাহা হইলে বলিব, নচেৎ বলিব না।

আর একটি কথা বলিয়াই এই মুখবন্ধ শেষ করিতেছি। যে অষ্টাদশটি প্রবন্ধ এই পুস্তকে একসূত্রে গ্রথিত হইল সেই প্রবন্ধগুলি বঙ্গীয় তত্ত্ববিদ্যা সমিতির মুখপত্র "ব্রহ্মবিদ্যায়"

এবং বঙ্গদেশের হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ মুখপত্র "উৎসবে" প্রকাশিত হইয়াছিল। উৎসবের সম্পাদক পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাম দয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয়। "ব্রহ্মবিদ্যার" সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম,এ, বি,এল মহাশয়। এই দুই বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ যে প্রকার আদরে আমার কথা তাঁহাদের পত্রে মুদ্রিত করিয়া থাকেন আজকাল সেইরূপ আদর অজ্ঞাত জনের ভাগ্যে এক প্রকার সুদুর্ল্লভ। আমি তাঁহা-দিগকে ধন্যবাদ দিতেছি না—যে স্থানে যুগাধিক কালের প্রাণের পরিচয় সেস্থানে মুখের ধন্যবাদ রুচিবিকার মাত্র। ইতি—

২রা ফাল্গুন,
বঙ্গাব্দ ১৩৩৩।
ধান্দিয়া, খুলনা।

শ্রীবিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

——0——

শ্রীশ্রীগুরু-রাজীব-চরণে।

পশ্চিম গগন সিন্দূররাগে রঞ্জিত করিয়া ভগবান্ মরীচিমালী চক্রবালান্তরালে প্রবেশ করিতেছিলেন। সন্ধ্যার অদৃশ্য-প্রায়, ধূসর ছায়াস্পর্শে গৃহ, প্রাঙ্গণ, তরু, লতা কেমন একটু কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। গৃহদ্বারে, পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, খঞ্জনীতে মৃদুমন্দ আঘাত করিয়া, মন্দ মন্দ, মিষ্ট মিষ্ট বোল্ তুলিয়া কে গাহিল—

"গুরু, তুমি ত পার হ'য়ে গেলে
একলা যেতে ভয় করে,—
ক্ষুরের ধার আর চুলের সেতু
পার হ'ব কেমন করে,
গুরু, পার হ'ব কেমন করে!"

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" সঙ্গীত "মন প্রাণ আকুল করিল!" হৃদয়ের গভীরতম, নিভৃত প্রদেশে কি এক ব্যাপার যে চলিতে লাগিল এতদিন পরে আজ তাহা

ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না। সেই ভাবের যতটুকু আবার মনে আসিতেছে তাহাও ঠিক বলিতে পারিতেছি না, কারণ—সেই ভাব প্রকাশ করিতে পারি এমন স্পষ্ট-অথচ-অস্পষ্ট, স্ফুট-অথচ-অব্যক্ত, মধুর-অথচ-বেদনাময়, সরল-অথচ-রহস্যময় ভাষা আমি বিদিত নহি। সেই দিবা ও নিশার সন্ধিক্ষণে, সেই প্রকৃতি-দেবীর ঈশ্বর-আরতিকালে, সেই স্থির, শান্ত, গম্ভীর, পবিত্র মুহূর্ত্তে সেই মধুর খঞ্জনীর সুমধুর বোল শুনিয়া, সেই ভাবাবেশে মৃদু-মন্দোচ্চারিত, সার-গর্ভ ও ভাবময় সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, তরঙ্গায়িত হৃদয়ে নিঃশব্দে অথচ দ্রুত পাদবিক্ষেপে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। মলিন-ছিন্ন-বস্ত্রখণ্ড-পরিহিত জনৈক বৈরাগী স্কন্ধের ঝুলি দ্বার-দেশে রাখিয়া অনাহার-ক্ষীণ-কণ্ঠে গাহিতেছিলেন। আমি আসিবামাত্রই ঝুলি অংসে তুলিয়া "ভিক্ষে দিতে হয় দিবি, না হয় না দিবি" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। কিছু-ক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিয়া গায়ককে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলাম। লোক ফিরিয়া আসিল। তিনি ফিরিলেন না।

সকলে বলিল "ও পাগল, ঐ রকম।"

উন্মাদগ্রস্তই হউন আর প্রকৃতিস্থই হউন, গানটিও বেশ, গাহিতেছিলেনও বেশ। গানটি ভাল লাগিবার অনেক

কারণ ছিল। একে সময় সুন্দর—দিবা ও নিশার মিলন কাল, প্রকৃতি দেবীর বদনখানি গাম্ভীর্য্যবিমণ্ডিত। চঞ্চল-চূড়ামণির মনও এমন গম্ভীর মুহূর্ত্তে ক্ষণতরে স্থির হয়, আসক্তির প্রিয়নিকেতন প্রাণেও এই শুভক্ষণে কেমন উদাসভাব ভাসিয়া উঠে। তাহার পর স্থান সুন্দর,—সম্মুখে স্বীয়-সহস্র-রক্তরশ্মি-বিজড়িত, অদৃশ্য-প্রায় দিনদেব আর লোহিত-রাগ-রঞ্জিত পশ্চিমাকাশ। দিবসের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিনমণি দিবাকর অন্তর্হিত হইতেছেন, পশ্চিম-গগনে এখনও তাঁহার কিরণচ্ছটা শোভা পাইতেছে, অন্ধকার ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিক্ গ্রাস করিতেছে,—এমন আধ্যাত্মিকভাব-ব্যঞ্জক-দৃশ্যদর্শনে কাহার মন না অন্তর্ম্মুখী হয়? এমন চিত্র দর্শন করিতে করিতে কোন্ ব্যক্তির চিত্ত না স্বীয় আশার আলোক ও নিরাশার অন্ধকারে ভাসিতে ও ডুবিতে থাকে? তাহার পর খঞ্জন্যুত্থিত মধুর ধ্বনি,—খঞ্জনী কি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কোমল করে গ্রহণ করিয়া বাজাইতেন? নহিলে এত মিষ্ট! আবার স্থির, শান্ত, মৃদু, মধুর কণ্ঠ,—প্রেমের গান গীত হওয়ার যোগ্য কণ্ঠ! তাহাতে সঙ্গীতগ্রথিত ভাব মধুর হইতে মধুর! গানটি ভাল লাগিবার প্রধান কারণ সঙ্গীতটী যেন শ্রোতারই স্বীয় হৃদয়-বেদনার কথা। গায়ক যেন আমারই কাতর হৃদয়ের

অন্তঃস্থল দর্শন করিয়া আমারই মর্ম্মবেদনার গীতি আপন বিষাদকণ্ঠে গাহিতেছেন। কবি তাঁহার ভাষায় গাহিয়াছেন,—বিষাদ-গীতিই মধুরগীতি। আর যদি এই বিষাদ-গীতি শ্রোতারই জীবনের কোন বিষাদ-কাহিনীকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে,—শ্রোতারই হৃদয়বীণার কোন ছিন্নতন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলে,—তাহা হইলে সঙ্গীত মধুরতমই বোধ হয়। সর্ব্বোপরি ভগবৎ কৃপা,—তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কি এমন মধুর লাগে? জীবনে কতদিন ঠিক এমনই সময়ে, ঠিক এমনই স্থানে, ঠিক এইরূপ গান ত শুনিয়া থাকি, কিন্তু কয়দিন এমনভাবে হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে,—কয়দিন এত সামান্য কারণে প্রাণে অব্যক্তমধুর বেদনা জাগিয়া উঠে, কয়দিন এত সামান্য আঘাতে রুদ্ধ হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, কয়দিন এমন সামান্য কারণে হৃদয়-সিন্ধু আলোড়িত হইয়া মহা তরঙ্গ উত্থিত হয় এবং তরঙ্গশীর্ষে ভাসিতে ভাসিতে কয়দিনই বা এতাদৃশ আনন্দধামে নীত হই? গায়ক চলিয়া গিয়াছেন, গান অনেক দিন হইল থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু তান আজিও প্রাণে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেই পবিত্র মুহূর্ত্ত চির-উজ্জ্বল রহিয়াছে। জননি, তোমার চরণ-সরোজে শতকোটি প্রণাম,—তুমি কত সুন্দর, তোমার কত দয়া!

শ্রীশ্রীগুরু-রাজীব-চরণে।

আজ এতদিন পরে এমনভাবে সেই পুরাতন সঙ্গীত হৃদয় আলোড়িত করিতেছে কেন? কি কারণে হৃদয়-সাগরে তরঙ্গের পশ্চাৎ তরঙ্গ ছুটিতেছে—

"ক্ষুরের ধার আর চুলের সেতু
পার হ'ব কেমন করে?"

কেন এমন করিয়া হৃদয় আলোড়িত করিতেছে? কেন এমন করিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিতেছে? আলোড়িত হইবে না? তরঙ্গ ছুটিবে না? বৎসরের পর বৎসর— কত বৎসর মহাকালসাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় মিশাইল, জীবনের কতকাল কাটিয়া গেল, কত চেষ্টাই করিলাম, প্রাণের উপর দিয়া কত যুদ্ধই হইয়া গেল তবুও ধর্ম্মজীবনে স্থির হইতে পারিলাম না। আজ উত্থান, কাল পতন,— এই সুখ, এই দুঃখ। শান্তিপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে বহিল না। ধর্ম্মজীবন যে "চুলের সেতু," "ক্ষুরের ধার" তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তাই পাষাণ-হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আজি উষ্ণ প্রস্রবণ ছুটিতেছে—

"ক্ষুরের ধার আর চুলের সেতু
গুরু, পার হ'ব কেমন করে!"

একাকী এই "ক্ষুর ধার" পথে চলিতে যাইয়া, অসহায়

অবস্থায় এই "চুলের সেতু" অতিক্রম করিতে প্রয়াস করিয়া কত প্রকারেই না বিড়ম্বিত হইতে হয়! ভুক্ত-ভোগী ব্যতীত সে গূঢ় কথা কে বুঝিবে? একাকী গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হওয়া সাধারণের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। পথমাঝে সতত শ্রীগুরুর সাহায্য না পাইলে আমাদের ন্যায় পথিক দিক্‌ভ্রান্ত ত হয়েনই, অধিক সময় ঈপ্সিত প্রদেশ অতিদূরে রহিয়া যায়। ব্যর্থচেষ্টা, নয়নজল এবং সময় সময় অধঃপতনই সারফল হইতে দেখা যায়। সাধনার অন্তরায় যে অসংখ্য, কত দেবতা ঈর্ষাবশে প্রতি-কূল হয়েন, মন ভুলাইবার জন্য সুন্দরী-শিরোমণি কত অপ্সরা আসিয়া সম্মুখে নৃত্য করে, ভয়প্রদর্শন করিবার জন্য কত ভীষণ-দর্শন রাক্ষস নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখায়।

উদ্দেশ্য-সাধন-বিষয়ে শ্রীশ্রীগুরুর নিত্য সাহায্য যে একান্ত আবশ্যক তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অতি সামান্য, নগণ্য বিষয়ে সফলতা লাভ করিবার জন্য কত শিক্ষকের শরণ লইতে হয়, আর এই যোগিজনদুর্ল্লভ, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ লাভ করিতে হইলে শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে না? কামনা,—অসাধ্য সাধন করিব, অধরকে ধরিব। লালসা,—বাক্য ও মনের অতীতকে বাক্য ও মনের বিষয়ীভূত করিব,—যাঁহার স্বরূপ বাক্যাতীত তাঁহার সহিত বাক্যালাপ

করিব, যিনি মনশ্চক্ষুরও অতীত তাঁহার "দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার-মকরন্দ-কণারুণ-চরণাম্বুজ" চর্ম্ম চক্ষুতে দর্শন করিব, হৃদয়ে ধারণ করিয়া অধম মানবজন্ম সফল করিব। বাসনা—রঙ্গময়ী, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, কুহকিনী মহামায়ার বিশ্ব-বিজয়ী ইন্দ্রজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া তদন্তরালস্থ শত-চন্দ্রবিনিন্দিত, অশেষ-সৌম্যাতি-সৌম্য শ্রীমুখ সন্দর্শন করিব। পিপাসা—কানন-শোভা, বল্লরী-ভূষণ, সুরভি প্রসূন চয়ন করিয়া চন্দন-চর্চ্চিত করতঃ সেই জগদারাধ্য রাজীব চরণে সজল-নয়নে প্রেমাঞ্জলি দিব, আর আমাকে তোমার কর, "মোকো চাকর রাখো জী" এই বর মাগিয়া লইব। এই ভূমণ্ডলে অগণিত মানবমাঝে একই সময়ে কয় জন ভাগ্যবান্ এই স্বর্গ-সুখের অধিকারী? জগতের আদি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কয়জন সাধক এই সাধ্য লাভ করিয়াছেন? বিশ্বজননীর প্রকৃত সন্তান, সফলকাম সাধক গাহিয়াছেন, "লক্ষে ঘুঁড়ি কাটে দু'একখানি, তুমি হেসে দাও মা হাত চাপড়ি"। পর্ব্বতশিখরে আজন্ম-ব্রহ্মচারী মৃদুহাস্যাধরে বলিয়াছিলেন "কোটিতেও একটি মিলে না"। লক্ষজনের মধ্যে একজনও যে অমূল্য রত্নের সন্ধান পায় না আমরা সেই দুর্ল্লভ রত্ন কণ্ঠে পরিতে চাই। কোটি জনের মধ্যে একজনও যে অমৃতের আস্বাদ পায় না

আমরা সেই অমৃতসরে চিরনিমগ্ন রহিতে চাই। বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চাই,—পঙ্গু হইয়া অভ্রভেদী গিরি লঙ্ঘন করিতে চাই। মূক হইয়া গীত গাহিতে চাহি। কীট হইয়া দেবতার চরণে পৌঁছিতে চাহি। এতাদৃশ দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে নিশ্চয়ই শিক্ষা চাই। সামান্য অর্থকরী বিদ্যা লাভ করিতে হইলে শিক্ষকের প্রয়োজন হয় আর পরাবিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজন হইবে না? অর্থকরী বিদ্যা লাভ করা যে অতি সহজ তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর শত সহস্র বালক, যুবক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। যাহা এত সহজ তাহা লাভ করিবার জন্য জীবনের কত বৎসর ব্যয়িত হইতেছে? যাহা এতাদৃশ সুসাধ্য তাহা করিবার জন্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কত গুরুমহাশয়ের শরণ লইতে হইতেছে? বাঙ্গালী-জীবনের অর্দ্ধাংশকাল এই অর্থকরী বিদ্যা অর্জ্জন করিতে ব্যয়িত হয় বলিলে বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না। আর শিক্ষক? তা সেই পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত হিসাব করিলে অর্দ্ধশত হইবে। যে বিদ্যালাভে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বালক ও যুবক কৃতকার্য্য হয় সেই বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যদি জীবনের অর্দ্ধেক

সময় পঞ্চাশৎ গুরুর চরণতলে বসিতে হয় তাহা হইলে যাহা কোটিতে একজন পায় না এমন দুর্ল্লভ বস্তু লাভ করিতে কত যুগযুগান্তর কত শত সহস্র গুরুর চরণাশ্রয়ে কাটাইতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বন্ধু, তুমি যে ভয়াকুল চিত্তে গাহিতেছ—

"গুরু, তুমি ত পার হ'য়ে গেলে,
একলা যেতে ভয় করে!"

ইহাতে তোমার অকর্ম্মণ্যতা প্রকাশিত হইতেছে না,—তুমি যে ভীরু কাপুরুষ ইহাতে এমন ভাব প্রকাশিত হইতেছে না। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে তুমি কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ,—জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃত পক্ষে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছ। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে তুমি প্রকৃত পথের পথিক, পথের পরিচয় তোমার কিছু হইয়াছে, বন্ধুর পথে তুমি চলিতেছ, রসের স্বাদ পাইয়াছ। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে,—তুতি সাধু! বন্ধু, তুমি সাধু! চল, দৃঢ়পদে, বীরমদে অগ্রসর হও। অদূরেই তোমার চিরশান্তিনিকেতন, অখণ্ড আনন্দ আর অনন্ত উৎসব!

রসজ্ঞশিষ্যোক্ত এই গুরু-প্রয়োজনীয়তা যথার্থ সাধকের

সহজেই বোধগম্য হয়। যাবৎ ধর্ম্মজীবনের অস্তিত্ব মুখের কথায় আর পরোপদেশদানে, যাবৎ সাধু হওয়ার ইচ্ছা ক্ষীণেচ্ছা মাত্র, যাবৎ কায়মনোবাক্য তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া তাঁহারই হওয়ার চেষ্টা করা না যায় তাবৎ সাধনায় শ্রীশ্রীগুরুর কোন আবশ্যকতা নাই এমন কল্পনা আমাদের থাকিতে পারে। কিন্তু যখন কল্পনার সীমার মধ্যেই বাস না করিয়া বাস্তব জগতে প্রবেশ লাভের প্রবলেচ্ছা জন্মে এবং সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রকৃত চেষ্টা আরম্ভ হয় তখন কল্পনা ছুটিয়া যায়, তখন সত্য সহজেই বোধগম্য হয়। যাবৎ কোন বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করা না যায় তাবৎ সেই বিষয় সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মনে উঠিতে পারে কিন্তু যখন প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য যথার্থ কর্ম্ম আরম্ভ করা যায় তখন কঠোর, নির্ম্মম অভিজ্ঞতার তীব্র অঙ্কুশাঘাতে সকল অসত্য ধারণা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, সত্য ফুটিয়া উঠে, কল্পনা টুটিয়া যায়। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যে কার্য্য অতি অনায়াস-সাধ্য মনে করে ভুক্তভোগী জানেন তাহা কত কঠিন।

ধর্ম্মজীবনের প্রাণ, চিত্তশুদ্ধি—আধ্যাত্মিক শুচি ও পবিত্রতা। এই শুচি সতত রক্ষা করিতে না পারিলে সত্যে

সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায় না। এই আধ্যাত্মিক পবিত্রতা যদি না জন্মিয়া থাকে তবে সন্ধ্যাহ্নিক, পূজা, জপ, তীর্থ কখনই যথাযথ করিতে পারা যাইবে না। এই শুচি লাভ যদি হইয়া থাকে তবে যে ধর্ম্মালম্বীই হই না কেন, কোন ভয় নাই ; আর যদি এই শুচি না পাইয়া থাকি তবে যে ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করিনা কেন, কোন ভরসা নাই। শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে, আহারে বিহারে—দৈনন্দিন প্রত্যেক কর্ম্মে এই শুচি বজায় রাখিতে হইবে। যদি সামান্য সামান্য কথায়, সামান্য সামান্য কার্য্যে এই পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় তবে ধর্ম্মজীবনে উন্নতি হইবে না। এই শুচি রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। একটি সামান্য চিন্তায়, মুহূর্ত্তের অঙ্গভঙ্গিতে, একটা মুখের কথায়, ক্ষণেকের অসতর্কতায়, "পান হইতে চূণ খসিলেই" এই শুচি নষ্ট হয়। এই শুচি রক্ষা করা যে কতদূর কঠিন তাহা কর্ম্মী প্রতিদিনই বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া থাকেন। এই পবিত্রতা-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য যে সাধক সজাগ হইতে চেষ্টা করিতেছেন তিনি অনতিবিলম্বেই বেশ বুঝিতে পারেন যে একজন অভিজ্ঞ, রসজ্ঞ মহাপুরুষের নিত্য সাহায্য ব্যতীত আমাদের চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়।

যখন দেখি যে—মধুর উষার মৃদু মন্দ সমীরণ সংস্পর্শে

সুশীতল দেহে, একান্তে, উন্মুক্তস্থানে উপবেশন করিয়া তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে রমণীর দেহকে কৃমিকীটালয় মাংস-পিণ্ডমাত্র বলিয়া বোধ হয়, এতাদৃশ ঘৃণা জন্মে যে কামের নামে সত্যসত্যই বমন আইসে এবং চিরদিনের মত কামের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইলাম মনে করিয়া আনন্দ হয়, অথচ নির্জ্জন স্থান পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজে প্রবেশ করিলে, উজ্জল-বৈদ্যুতিকালোকবিভাসিত, সুমন্দ-মলয়-সেবিত, বিবিধ-কারুকার্য্যখচিত, চিত্রিত-বিচিত্রিত চারুকক্ষে ক্ষণপ্রভাচঞ্চলকটাক্ষময়ী, সুগন্ধ-সুরভিত-মনোহর-পরিচ্ছদ-শোভিতা, সুচারুহাসিনী, বিলাসবিভ্রমময়ী, চার্ব্বাঙ্গী সুন্দরী-শিরোমণির সমক্ষে রমণীকে আর কৃমিকীটালয়, ঘৃণিত মাংসপিণ্ডমাত্র বলিয়া বোধ একেবারেই হয় না—বরঞ্চ "লাবণ্যলতিকা সম রমণী এ ভবে" এই গান আপনা হইতে অধরে কম্পিত হইতে থাকে,—সকল বিচার ছুটিয়া যায়, বাসনার অনলে দগ্ধ হই—তখন নিদারুণ অনুতাপের সহিত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি একজন শক্তিমান্, রহস্যবিদ্ গুরুর কত প্রয়োজন! তিনি থাকিলে কি আজ এত বিড়ম্বনা ঘটিত! আমার অবস্থানুরূপ সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতেন,—আমাকে আর এইরূপে অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হইতে হইত না।

শ্রীশ্রীগুরু-রাজীব-চরণে।

যখন দেখি যে—যে সময় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহই কিছুই বলেন না, আমার সকল ইচ্ছাই হেলায় পূর্ণ হয়, আহার-বিহার-বসন-ভূষণ কোন বিষয়েই আমার কোন অভাবে থাকে না, দাসদাসী আত্মীয় স্বজন আমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমাকে ভাবিতে ও গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয় না, আমার দোষকেও লোকে গুণ বলে সে সময় আমার মনের অবস্থা বেশ থাকে, ক্রোধপরায়ণতা তখন আমার নিকট অত্যন্ত নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হয়, সংসার-তাপ-দগ্ধ, বিবিধানমুকূল-ঘটনাবিড়ম্বিত হতভাগ্য কেহ যদি বিশেষ কারণ সত্ত্বেও ক্রুদ্ধ হয়েন তাহা হইলে তিনি আমার নিকট তখন অতি হীন বলিয়া প্রতীত হয়েন, তাঁহার দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া আমার করুণার উদ্রেক হয়, অথচ যে সময় আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে কেহ কিছু বলেন, আমার দুই একটী ইচ্ছাও অপূর্ণ রহিয়া যায়, আমার আহার-বিহার-বসনভূষণের সামান্য ত্রুটি হয়, আমার সকল আদেশ সকলেই অবনত মস্তকে পালন করেন না, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমাকে একটু বেগ পাইতে হয়, আমার বহু দোষের একটীকেও কেহ ত্রুটি বলিতে সাহস করেন তৎক্ষণাৎ আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, সুখের সময় যে ক্রোধ অতি ঘৃণিত বলিয়া

বোধ হইয়াছিল সেই ক্রোধ তখন আমার জ্ঞান হরণ করে, ক্রোধবশে যাহাকে যাহা না বলিবার তাহাকে তাহা বলি, যাহা না করিবার তাহা করিয়া বসি, শতদিনের সুকঠোর চেষ্টায় অর্জ্জিত সৌন্দর্য্য যখন এইরূপ মুহূর্ত্তের ধৈর্য্যচ্যুতিতে উড়িয়া যায়, শূন্য বক্ষ পড়িয়া রহে, স্বর্গীয় শান্তির স্থানে নারকীয় গ্লানি আসিয়া হৃদয় অধিকার করে তখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি, শিক্ষকের কত আবশ্যক। আজ যদি শ্রীশ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ে থাকিতাম, আজ যদি তাঁহার কৃপাপূর্ণ সতর্কদৃষ্টির মধ্যে বাস করিতাম তবে এই মহা-দুর্ঘটনা কি ঘটিত! জীবন কি মুহূর্ত্তের অসহিষ্ণুতায় এমনই ভাবে শুষ্ক হইয়া যাইত!

যখন দেখি যে—যে সময় অভ্রভেদী শৈলশিখরে সুখাসনে উপবিষ্ট হই, মোহময় মানবসমাজ বহুদূরে নিম্ন-ভূমিতে পড়িয়া রহে, যে সময় সীমাহীন, সুনীল, নভো-মণ্ডল ঊর্দ্ধে তাহার প্রকাণ্ড দেহ বিস্তৃত করিয়া তাহার অসীম নীলিমা মাঝে আমার সসীম দেহখানিকে বিলীন করিয়া দেয়, যে সময় চতুর্দ্দিকস্থ, দিগন্তবিস্তৃত জনমানবশূন্য পর্ব্বতমালা নীরবে এক মহাস্তব নিয়ত পাঠ করিয়া আমাকে গম্ভীর করিয়া তুলে, যে সময় বিহগ-কূজন-শব্দায়িত, নয়না-ভিরাম, সবুজ বনভূমি তাহার উজ্জ্বল মধুর সৌন্দর্য্য প্রতিলোম-

কৃপ-পথে আমার হৃদয়াভ্যন্তরে ছড়াইতে থাকে, যে সময় আমার প্রাণ-পাখী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত বিমানে উধাও উড়িয়া যায়, তখন রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দের দৃঢ় বন্ধন টুটিয়া যায়, পৃথিবীর সকল বস্তুই অসার বলিয়া বোধ হয়, মনমাঝে এক অনির্ব্বচনীয়, প্রশান্ত, মুক্ত ভাব জাগিয়া উঠে, পাশমুক্তির আনন্দে হৃদয় ভাসিয়া যায়, তখন এই বিচিত্র বিশ্বের একমাত্র অধিকারী সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ত্রী-কেই—

"সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী"॥

বলিয়া অন্তরের অন্তরে অনুভব করি এবং তাঁহার কৃপা-লাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করিয়া যুক্তকরে প্রার্থনা করি—

"দেবী প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য"॥

অথচ যখন প্রকৃতির রম্যনিকেতন, শান্তিদেবীর লীলাভূমি শিখরি-শেখর, সুনীল গগনতল, সবুজবনভূমি পরিত্যাগ

করিয়া লোকালয়ে পুনঃ প্রবেশ করি, যখন অসীম পর্ব্বত শ্রেণীর পরিবর্ত্তে সসীম প্রাসাদ-শ্রেণী নয়ন পথে পতিত হয়, যখন বিগহগীতির পরিবর্ত্তে স্তাবকের মিথ্যা যশোগান, নিন্দকের অসত্য ঘৃণোক্তি কর্ণকুহরে বাজিতে থাকে. যখন প্রাণ-পাখী অসীম আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার সঙ্কীর্ণাদপি সঙ্কীর্ণ কোটরে পুনঃ প্রবেশ করে,—হায়! কি বিড়ম্বনা!—যখন বিবিধ ভোগ্যবস্তু সম্মুখে বিস্তৃত দেখি, যখন সকল ব্যক্তিই সেই সকল ভোগ্যবস্তু অবলম্বন করিয়া কেমন সুখে কাল হরণ করিতেছে তাহা ক্রমাগত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, দেখিতে থাকি তখন আবার এই পৃথিবী অতি সুন্দর বলিয়া মনে হয়, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ আবার তখন তাহাদের ইন্দ্রজাল আমার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করে, ভোগের জন্য কুহক-মুগ্ধ আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তখন সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। আজ যদি নিপুণ মাঝি থাকিতেন তাহা হইলে তীরে আসিয়া তরী কি এমন করিয়া ডুবিত! জীবন সমুদ্রের কোন্ অংশে কোন্ শৈল নিমজ্জিত আছে, কোন্ মেঘ আকাশ ছাইলে এই সাগরে তরঙ্গ উঠে,—কোথায় বিশ্রামের আশ্রয় মিলে—এই সমুদয় সম্যক্‌রূপে যে মহাজন পরিজ্ঞাত, আজ তিনি সঙ্গে থাকিলে কি এমন হয়!

শ্রীশ্রীগুরু-রাজীব-চরণে।

যখন দেখি—যে দিন ব্রহ্মা, মুরারি, ত্রিপুরান্তকারী, ভানু, শশী, ভূমিসুত, বুধ, গুরু, শুক্র, শনি ও রাহু কেতু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সুপ্রভাত করেন, যেদিন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন, যেদিন প্রভাতে শ্রীশ্রীদুর্গা-স্মরণে আমার অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় সেইদিন আমার আমিত্ববোধ বিলুপ্ত হয়—আমি থাকি না, আমার জনক জননী, সোদর সোদরা, স্ত্রী পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেহই থাকেন না, আমার দেশ, গৃহদ্বার কিছুই থাকেনা, আমি ও আমি ছাড়া বিশ্ব—এই দু'য়ের পার্থক্য বোধ থাকে না, সেইদিন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এক অখণ্ড, জ্যোতির্ম্ময়, অসীম সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবিয়া যায়, আমি ও আমার এই বিশ্ব সেই সাগরের অবিচ্ছিন্ন ও অচ্ছেদ্য অংশ হইয়া যাই, সেইদিন এই সচ্চিদানন্দ সাগরের অংশ হইয়া সত্যসত্যই অনুভব করি, আমি ব্রহ্মেরই অংশ; আমার শোক নাই, তাপ নাই, জ্বালা নাই, যাতনা নাই,—আমি "শোকভাক্" নহি; আমার কাম নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্য নাই—আমার বন্ধন নাই, আমি "নিত্য মুক্ত"; আমার চাঞ্চল্য নাই,

ভাবান্তর নাই, আমি পথভ্রান্ত হইনা—আমি সদা"স্বভাবস্থ" ; আমার জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, আমার আদি নাই, অন্ত নাই, আমার নির্জীবতা নাই, অপ্রফুল্লতা নাই, বিষাদ নাই, অবসাদ নাই—আমি "সচ্চিদানন্দ" ; সেই দিন তখন আমার এত বিচার আইসে না, এত বিশ্লেষণ করিবার শক্তি থাকেনা, মনের কথা এমন করিয়া লিখিবার ইচ্ছা থাকেনা, সেইদিন তখন কেবল এক জগদ্ব্যাপী জ্যোতিঃ সমুদ্র জ্বলিতে থাকে, আর এক অখণ্ড আনন্দের মধুর অনুভূতি মাত্র থাকে, অথচ যে দিন মঙ্গলময়েরা আমার প্রতি ফিরিয়া চাহেন না, আমার সুপ্রভাত করেন না, যে দিন মঙ্গলময়ী জননীরা আমার প্রতি বিরূপ হয়েন, যে দিন প্রভাতে জগজ্জননী আমার অন্ধকার দূর করেন না সেই দুর্দ্দিনে আমার আমিত্ব পুনর্জীবিত হইয়া উঠে, আমার পিতামাতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব শত্রু সকলেই একে একে প্রকাশিত হয়েন, আমার জন্মভূমি, গৃহদ্বার সকলই ভাসিয়া উঠে, আমি ও এই জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যাই—আমাদের মধ্যে কোনও সম্পর্কই আর থাকে না, আমার স্বার্থ ও জগতের স্বার্থ সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বোধ হয়,—আমার চাঞ্চল্য ঘটে, ভাবান্তর উপস্থিত হয়,

এই দ্বন্দ্বে মাতিয়া আমি শোক তাপ জ্বালা যাতনার অধীন হই, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের তাড়নে আমি তখন অসীম যাতনা পাইতে থাকি—যখন এইরূপে দেখি যে, প্রভাতে যে বস্তু অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি সন্ধ্যায় পুনরায় সেই বস্তুকেই সারাৎসার বলিয়া হৃদয়ে ধরিতেছি, যখন এইরূপে দেখি যে বিচারকালে যাহা ত্যাজ্য বলিয়া স্থির করিলাম, প্রলোভন উপস্থিত হইলে তাহাকেই সার বলিয়া গ্রহণ করিলাম তখন এই মোহাবর্ত্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য একজন মোহাতীত যোগ্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যে কত প্রয়োজনীয় তাহা সুন্দরভাবে অনুভব করি।

যখন দেখি—যে সময় স্থির মনে আমার পরিচিত ব্যক্তিবর্গের সহিত আমার তুলনা করি, এই কলিকাতা নগরীর জনসমূহের সহিত আমার তুলনা করি, এই বাঙ্গালা দেশের লোকসমূহের সহিত আমার তুলনা করি, এই ভারতবর্ষের জনসঙ্ঘের সহিত আমার তুলনা করি, যে সময় সলিল-রাশি-পরিবেষ্টিতা আমাদের এই পৃথিবীর মহত্ব ও বৈচিত্র্যের বিষয় চিন্তা করি, যে সময় বৈচিত্র্যময়, গ্রহ-উপগ্রহ-পরিবেষ্টিত সৌর-জগতের কথা ভাবি সেই সময় আমি যে অতি সামান্য, দীনাতিদীন, হীনাতিহীন ক্ষুদ্র ধূলিকণারও অধম

তাহার বেশ উপলব্ধি হয়, আমার অহঙ্কার, মদ আমার অসারত্ব দর্শন করিয়া লজ্জায় দ্রুতপদে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে, অথচ যখন এই বিশ্বের মহত্ত্ব ও বৈচিত্র্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে না, যখন জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যায় আমার অপেক্ষা হীন কোন ব্যক্তির সমক্ষে উপস্থিত হই—তখনই "এরণ্ড" আমি "দ্রুম" হইয়া বসি—বসিবার ভঙ্গি দাঁড়াইবার 'কায়দা', কথার ঢং ইত্যাদিতে মদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করি—তখন এই ভ্রান্তি-সম্ভূত মদ দমনের জন্য উপায় অনুসন্ধান করি এবং মদবর্জ্জিত জনৈক প্রভুর শরণ লওয়ার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, তখন শ্রীগুরুর উপদেশের আবশ্যকতা সুন্দররূপে অনুভব করি।

যখন দেখি – যে সময় আমার সমকক্ষ কেহ নয়নগোচর হয় না, যে সময় যে দিকেই চক্ষু ফিরাই না কেন দেখি বিদ্যাবুদ্ধি ধন সম্পদ্ মান মর্য্যাদায় সকলেই আমার অপেক্ষা হীন তখন সকলের প্রতি সহানুভূতি হয়, তখন প্রত্যেকের দুঃখের জন্য দুঃখ পাই, তখন সকলের প্রতি করুণার উদ্রেক হয়—তাহাদের উন্নতির জন্য প্রার্থনা করি, অথচ যখন দেখি আমারই পরিচিত কেহ,—কাল যে আমার সমান ছিল,—বেশ বড় হইতেছে, বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া "মানুষ" বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তখন প্রাণের মাঝে কেমন

একটু অস্বস্তি বোধ হয়,—যেন সে অত বড় না হইলেই ভাল হইত, যেন যে কোন ভাবেই হউক সে বেশ একটু পড়িয়া গেলে প্রাণটা বেশ আরাম পায়,—তখন হয়ত তাহার কুৎসা করি,—প্রথম পরিচয়ে যাহার বিশ্বব্যাপী জ্ঞান দেখিয়া অন্যের নিকট পরিচয় করিয়া দিয়াছি আজ আবার তাহাকেই তাঁহাদের নিকট পাগল বলিয়া ছোট করিবার প্রয়াস করিতেছি,—তখন মাদৃশ হীনজনকে উন্নতির পথে প্রেরণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুর নিত্য সাহায্য যে কত আবশ্যক তাহা আর তর্ক করিয়া জানিয়া লইতে হয় না—বিষময় অভিজ্ঞতাই পরম শিক্ষকের কার্য্য করে।

যখন এইরূপে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে থাকে, যখন এইরূপে উত্থান পতন অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে, যখন এইরূপে মহা-সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকি তখন বুঝি একজন অভিভাবকের কত প্রয়োজন, তখন কখনও জ্বালায় উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করি—

> "আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে চণ্ডালে,
> এ দীক্ষা শিক্ষার্থে যারে গুরুপদে ধরি
> এ তত্ত্ব স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে ;"

তখন কখনও গভীর মর্ম্মবেদনায় নীরবে নির্জ্জনে রোদন করি,

নির্ম্মাল্য।

"যতবার আলো জ্বালাতে যাই নিভে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।"

মন, যদি এই ভয়ঙ্কর মর্ম্মপীড়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে চাও, যদি এই যন্ত্রণাময় উন্মাদাবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাও, যদি এই লয় বিক্ষেপের অবস্থা অতিক্রম করিতে চাও, যদি চিরদিন সর্ব্বক্ষণ শান্তি-সরোবরে প্লব-মান হইয়া মনের আনন্দে, প্রেমাশ্রুলোচনে গাহিতে চাও—

"নিবিড় আঁধারে, মা, চমকে তোর অরূপ-রাশি,
তাই যোগী ধ্যান করে, হ'য়ে গিরিগুহাবাসী।
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে
চির শান্তি পরিমলে অবিরত যায় ভাসি।
মহাকালরূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে (ওমা) কে তুমি গো একা বসি,
অভয় পদ কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি",

তাহা হইলে দীনহীন হইয়া যাও, বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া ফেল, যাহা যাহা কিছু শিখিয়াছ সকল ভুলিয়া যাও, নিজকে মূর্খাদপি মূর্খ বলিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, দীনহীন বেশে, গললগ্নীকৃত-বাসে

শ্রীশ্রীগুরু-রাজীব-চরণে।

শ্রীশ্রীগুরুর রাজীব চরণে শরণ লও। মহা-যাদুকরী, মোহময়ী, জগজ্জননী মহামায়ার সহিত শ্রীগুরুর পরিচয় আছে—তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হওয়ার পথ শ্রীশ্রীগুরু-পরিচিত, শ্রীশ্রীগুরু কৃপাপূর্ব্বক তোমার হস্ত ধারণ করিলে আর তোমাকে উত্থান—পতনের জ্বালা ভুগিতে হইবে না। শ্রীশ্রীগুরু তোমাকে মন্ত্র দিয়া "প্রণামী" গ্রহণ করিয়াই অন্য শিষ্যের আলয়ে গমন করিবেন না—তোমার অজ্ঞানান্ধকার পূর্ব্ববৎ রহিয়া যাইবে না—"তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে" রহিবে না। তাঁহার চরণ স্পর্শে তোমার নবশক্তি জাগিবে। যে প্রলোভন পূর্ব্বে শত চেষ্টা করিয়াও দূর করিতে পারিতে না—এক্ষণে কেবল শ্রীশ্রীগুরুর চরণ স্মরণ করিলে সেই প্রলোভন দূরে পলায়ন করিবে। শ্রীশ্রীগুরু সর্ব্বক্ষণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবেন,—তিনি স্থানকালব্যবধানের অতীত—সকল দুঃখ দুর্ব্বিপাকে তিনি তোমার স্বতঃ-প্রণোদিত সহচর। তুমি যাহা বুঝিতে পারিতেছ না তিনি তাহা হাস্যমুখে বুঝাইয়া দিবেন। যে সঙ্কেতের অভাবে তুমি সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ধরিতে পারিতেছ না সেই কর্ম্ম-সঙ্কেত শ্রীশ্রীগুরু তোমাকে শিখাইয়া দিবেন। তুমি যাহা আপনি করিতে পারিতেছ না তিনি তোমার হইয়া তাহা করিয়া দিবেন। তোমার সকল চেষ্টা এক্ষণে

সফল হইবে। বিফলমনোরথ হওয়ার কষ্ট আর তোমাকে পাইতে হইবে না। তোমার দিন দিন উন্নতি হইবে। জগজ্জননীর পুত্র জগজ্জননীর সহিত তোমার সম্পর্ক সংস্থাপিত করিয়া দিবেন, তুমি পরম শান্তি পাইবে।

মন, এস এস,—যাঁহার সদানন্দ মূর্ত্তি স্মরণে, যাঁহার জ্ঞান-ভক্তি-সমুজ্জ্বল-বিশাল-ললাট-স্মরণে প্রাণে যুগপৎ হর্ষ, শান্তি, ভক্তি, ভরসা জাগিয়া উঠে, যিনি আমার উত্থান-পতন দূর করিবেন, যিনি আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিবেন, যিনি আমাকে মায়ের চরণে লইয়া যাইবেন, যাঁহার কৃপায় আমার মানব জন্ম সফল হইবে তাঁহার রাজীব চরণে ভক্তিভরে, যুক্তকরে, গললগ্নীকৃত-বাসে, সাশ্রু-নয়নে প্রণাম করি।

*　　*　　*　　*

বন্ধু, তুমি দ্বারে দ্বারে যে গান গাহিতেছ তাহা গাহিয়া যাও। তোমার কথায় আমাদের ভ্রান্তি অপনোদিত হইবে —আমরা শ্রীশ্রীগুরুর চরণে দৃষ্টিপাত করিতে শিখিব। গুরো! প্রভো! স্বামিন্! তোমাকে এ অধম আর কি বলিবে! আমার শত অপরাধ হইতেছে ও হইবে—আমি অতি হীন; তুমি আমাকে তোমার চরণাশ্রয় হইতে দূরে

শ্রীশ্রীগুরু-রাজীব-চরণে।

ফেলিয়া দিও না। ইষ্টস্বরূপ! তুমি চলিয়া গেলে আমি যাইতে পারিব না, তুমি দয়া না করিলে—

"ক্ষুরের ধার আর চুলের সেতু
পার হ'ব কেমন করে!"

ছাইভস্ম।

কেমন স্বভাব দু'পয়সার যোগাড় করিতে পারিলেই ভারতের অতীত, অতি প্রাচীন, গৌরবের স্থান দেখিতে ইচ্ছা জাগে। সংসারে আমার বিশেষ কোন বন্ধন নাই। অতি শৈশবে পিতার মৃত্যু হয়, তাঁহার মুখ আর এখন মনে পড়ে না। তাহার পর কতকষ্ট, কতদুঃখ গিয়াছে, তাহাও এখন আর সর্ব্বদা মনে পড়ে না; বর্ত্তমানে তত কষ্ট নাই, সুতরাং অতীত দুঃখের কথা সর্ব্বদা মনে জাগে না। স্নেহময়ী জননী একমাত্র বন্ধন ছিলেন। তিনিও স্বর্গে গিয়াছেন। আমার শেষ বন্ধন ছিঁড়িয়াছে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছেন, ভ্রাতৃবধূগণ আছেন। তা তাঁহাদের জন্য আমার কোন বিশেষ ভাবনা নাই, কারণ তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট নাই। আমি অবিবাহিত,—সুতরাং নূতন বন্ধন কিছু সৃষ্ট হয় নাই। সংসারের মান প্রতিপত্তি আমার বন্ধন নহে, কারণ, তাহা আমি বড় একটা চাহি না। এমন বন্ধন-শূন্য অবস্থায় ইচ্ছামত স্থানে যাতায়াতের প্রতিবন্ধক আমার বিশেষ কিছু নাই। এক অভাব অর্থের। তা দিন আনি দিন খাই। ইহারই মধ্যে যদি কিছু কষ্টে জমাইতে পারি

তাহা লইয়াই বাহির হইয়া পড়ি। কোথায় যাইব, কাহার আশ্রয়ে থাকিব, এই ভাবনা কখনও করি নাই, কষ্টও কখন পাই নাই। সোনার ভারত এখনও অতীত আতি-থেয়তা একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার সুবিমল স্রোতে এখনও ভারতের সকল গৌরব ভাসিয়া যায় নাই,— এখনও ভারতে প্রকৃত ভারতবাসী আছেন, বিদেশী দেখিলে এখনও ভারতবাসী আশ্রয় দিয়া থাকেন। প্রার্থনা করি, ভগবান্ ভারতের এই শেষ গৌরব-টুকু কাড়িয়া লইবেন না। সকলইত গিয়াছে, দরিদ্রের এই শেষ অব-লম্বন যদি তিনি কাড়িয়া লয়েন তবে কি লইয়া আর এই শ্মশানে থাকিব ?

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। অযোধ্যা দেখিতে গিয়াছিলাম। ষ্টেশনে নামিয়া কোথায় যাইব ভাবিতেছি এমন সময় পাণ্ডা মহাশয় আসিলেন। অযোধ্যায় আমি এই নূতন আসিয়াছি। অযোধ্যা চিনি না। পাণ্ডার আগমনে নিশ্চিন্ত হইলাম। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষ্টেশন হইতে বাহির হইলাম। তখনও রাত্রি আছে। অদূরে নৈঋর্ত কোণে, তালগাছের মাথার উপর চাঁদ হাসিতে ছিলেন। চাঁদের আলোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত। শান্ত, উজ্জ্বল, গম্ভীর, আলোক। আকাশে নক্ষত্র বড় একটা ছিল

না। একটু একটু শীত বোধ হইতেছিল। পাণ্ডা ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রিকালেই বাসায় যাইবার জন্য বাহির হইব, কি রাত্রি-প্রভাতে যাত্রা করিব? 'মুসাফের খানায়' থাকিবার কষ্ট দেখিয়া রাত্রিকালেই বাহির হইলাম। বিদেশ বলিয়া বড় একটা ভয় হইল না। কারণ, সঙ্গে মাল-পত্র টাকা কড়ি বিশেষ কিছু ছিল না। জীবনের ভয়, তা বোধ হয় নাই। মরণের ভয় কাহার হয়? যাহার বন্ধন আছে তাহারই মরণে ভয় হয়—মরিলে প্রিয়জনকে দেখিতে পাইব না, স্নেহের পুত্তলি কষ্ট পাইবে, এই মমতা যাহার আছে মরণে ভয় তাহার হয়। আমার প্রিয়জন কেহ নাই, মরণ হইলে আমি কোন ক্ষতি মনে করি না। আর পাপীর মরণে ভয় হয়। আমি পাপ করি নাই এরূপ কথা বলিতেছি না। তবে পাপী হইলেও মরণে আমি ভীত নহি; কারণ, কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে, ইহ-জীবনেই হউক আর পরজীবনেই হউক—যে জীবনেই হউক ভোগ যখন করিতেই হইবে তখন আর তাহাতে ভয় করিয়া লাভ কি?

ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া, আম্রকানন সমীপে দাঁড়াইয়া স্থির মনে চাঁদের পানে চাহিলাম। অতি সুন্দর দেখিলাম। অযোধ্যার চাঁদ বুকের মাঝে সৌন্দর্য্য ছড়াইতে ছিলেন;

আকাশের চাঁদ বড়ই সুন্দর লাগিল। মন প্রাণ শান্ত হইল। মনে যে কত কথা উঠিতে লাগিল, পুরাতন কালের কত কথাই যে আসিয়া হৃদয়ে জমাট বাঁধিতে লাগিল তাহা আর কি বলিব। পুণ্যভূমির পূতস্পর্শে হৃদয় শান্তিসাগরে ডুবিল। কে বলে তীর্থ গমনে উপকার নাই? যাঁহারা দল বাঁধিয়া, হাস্যকোলাহলে মগ্ন হইয়া, চা-চুরুটের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে সরল হারমোনিয়মে তরল আলাপ করিতে করিতে, কঠোর তবলা ঠুকিয়া ঠুংরি বাজাইয়া রসভরে বাজে টপ্পা গাহিতে গাহিতে, তীর্থে "হাওয়া খাইতে" যান তাঁহারা তীর্থ-গমনের উপকারিতা কিছুই অনুভব করিতে না পারেন, কিন্তু যিনি ভক্তিপূর্ণ অন্তরে অতীত কাহিনী ধ্যান করিতে করিতে তীর্থে গমন করেন তিনি সেই পবিত্র ভূমির প্রতি রজঃকণাতে মহিমা দর্শন করেন, তিনি তীর্থ-দর্শনে শান্তিলাভ করেন, জন্ম সফল বোধ করেন। এইরূপ ভাব লইয়া তীর্থ গমন করিয়া দেখিলে সত্যাসত্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আশা করি, আমরা আবার তীর্থ দর্শন করিতে শিখিব। জন-মানব-শূন্য বিন্ধ্যাচল-চূড়ায় একজন যোগীও তীর্থদর্শন সম্বন্ধে এক সময়ে এইরূপই বলিয়াছিলেন।

আমি রাত্রি থাকিতে থাকিতেই রওনা হইতে সম্মত দেখিয়া পাণ্ডাজী গাড়ী আনিতে গেলেন। আমি দাঁড়াইয়া

ষ্টেসনের ভিড় দেখিতে লাগিলাম। কত দেশের ভিন্ন রকমের লোক। শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ছুটির সময় অবকাশ পাইয়া অনেকেই বাহির হইয়াছিলেন। আজকাল অবসর পাইলে আমরা—বাঙ্গালার বাবুরা দল বাঁধিয়া "পশ্চিমে" "তীর্থগমন" করি। অনেকে বলেন প্লেগের ন্যায় ঐটী বাঙ্গালার একটা নূতন ব্যাধি। কিন্তু ক্ষতি কি? তবে যেমন ভাবে তীর্থদর্শনে যাওয়া হয় অমন ভাবে না যাইয়া একটু পৃথক ভাবে যাওয়া ভাল বলিয়া বোধ হয়। তীর্থস্থানে উপস্থিত হইয়া অন্য সময়ের ন্যায় বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও দাস দাসী লইয়া তরল আমোদ প্রমোদে ব্যাপৃত থাকিলে তীর্থ-মহিমা কি সম্যক প্রকারে অনুভব করিতে পারা যায়? আধ্যাত্মিক রাজ্যের খেলা মন লইয়া। সেই মনই যদি বিষয়ান্তরে নিমগ্ন রহিল তবে আর রসাস্বাদ করাইবে কে? তবে একেবারে না যাওয়া অপেক্ষা এমন ভাবে যাওয়াও ভাল, কাহারও ভাগ্যে হয়ত ভাল ফল ঘটে, মুহূর্ত্তে জীবন-প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হয়। যাঁহার ভাগ্যে তেমন ফল না ঘটে তাঁহার দেশভ্রমণ করাও ত হয়। ঘরের কোণে সারা বৎসর বসিয়া না থাকিয়া মাঝে মাঝে এমন বাহিরে গেলে অভিজ্ঞতা জন্মে, শরীর ভাল হয়, প্রাণও বড় হয়।

ছাইভস্ম।

পাণ্ডাঠাকুর গাড়ী লইয়া আসিলেন। এমন গাড়ী পূর্ব্বে আর কখনও চড়ি নাই। দুচাকার গাড়ী। উপরে একটু খড়ের ছাউনি আছে। সামনে একটী মানুষে টানে, পশ্চাতে একটী মানুষে ঠেলে। কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে যানে উঠিলাম। লোক দুটি বেশ স্ফূর্ত্তি-পূর্ব্বক গাড়ী টানিতে ও ঠেলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পশ্চাৎ হইতে ঐরূপ আর একখানি গাড়ী আসিয়া পড়িল। আর একখানি গাড়ী পশ্চাৎ হইতে বেগে আসিতেছে দেখিয়া আমাদের গাড়ীর লোক দু'জনা ছুটিতে লাগিল। আমাদের গাড়ী প্রবল বেগে চলিতেছে দেখিয়া পশ্চাতের গাড়ীও অত্যন্ত বেগে চলিতে লাগিল। দুইখানি গাড়ীরই বাহকের (চালক বলিব না বাহক বলিব?) মুখেই বেশ স্ফূর্ত্তির মৃদু হাসি। বুঝিলাম "পাল্লা" লাগিল। ভারি বিস্ময় জন্মিল,—মানুষে গাড়ী টানিতেছে, এত সামান্য কাজে এত স্ফূর্ত্তি! শেষে ভাবিয়া দেখিয়াছি এই স্ফূর্ত্তি ভাল। আমাদের যাহার যে কাজ তাহা যদি আমরা স্ফূর্ত্তিসহ সুচারু-রূপে সম্পন্ন করি তবে তাহাতেই আমাদের মর্য্যাদা, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব। আর যদি সামান্য কার্য্য বলিয়া কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকি তবে আমাদের

কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, আমাদের অমর্য্যাদা হয়, সুখও হয় না।

ক্রমে চাঁদের আলোক ম্লান হইয়া আসিল। পূর্ব্বাকাশে পিঙ্গল আভা ফুটিয়া উঠিল। আমাদের গাড়ী দুসারি বাড়ীর মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। গৃহচ্ছাদ হইতে গৃহচ্ছাদে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে, শাখা হইতে শাখান্তরে হনূমান্ লাফাইয়া পড়িতেছিল! এক এক স্থানে বহু হনূমান্ বিচরণ করিতেছিল! বাঙ্গালা দেশে পাড়াগাঁয়ে মাঠে যেমন দলে দলে গরু চরে ইহারাও সেইরূপ ভ্রমণ করিতেছিল। কাহারও বক্ষে একটী বাচ্ছা; কাহারও বক্ষে একটী, পৃষ্ঠে একটী; কাহারও বক্ষে একটী, পৃষ্ঠে একটী, পশ্চাতে দুইটী। সে অতি মনোরম দৃশ্য! সামান্য জীবের প্রাণে কত স্নেহ, কত মমতা। মায়ের স্নেহ কত অত্যা-চারই সহিয়া থাকে,—জননীর জীবন কত ভারের! বক্ষে পৃষ্ঠে পশ্চাতে বৎস-সহ হনূমান্ দেখিয়া আমাদের দেশের কৃষক-পত্নীর কথা মনে পড়িল! স্কন্ধে একটী শিশু, কক্ষে একটী বৃহৎ কলসী, পশ্চাতে হাসিমুখে বালক বালিকা,—বাঙ্গালার লক্ষ্মী হাস্যমুখে প্রতিবেশিনী বয়স্যার সহিত রহস্য করিতে করিতে বাঙ্গালার পল্লী-পথ সরস মধুর করিয়া চলিয়াছেন! আসুন, আমরা এই নয়নাভিরাম,

হৃদয়-বেদনাপহারী দৃশ্য দেখিয়া নয়ন সফল করি। কে বলে ভারতে সুখ নাই? কে বলে ইউরোপের আদর্শে ভারত-রমণীকে গড়িয়া তুলিতে হইবে? হাবভাবপূর্ণা, বিলাস-বিভ্রমময়ী পাশ্চাত্যরমণী অপেক্ষা আমার এই কৃষকবধূ কত সুন্দর! আমরা সাহেব সাজিয়াছি, আমরাই সাহেব থাকি, আমাদের জননী, ভগিনীকে আর মেম্ করিব না। বাহিরে পাদুকামণ্ডিতপদাঘাত খাইয়া ঘরে আসিয়া শান্তিলাভের পথ রোধ করিও না। ভারত-মন্দিরের আভাময়ী, শান্তি-দায়িনী দেবীকে এমন করিয়া নিষ্প্রভ করিও না।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া একখানি বৃহৎ দ্বিতল বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইল। পাণ্ডার আদেশমত গাড়ী হইতে নামিলাম। গাড়ীভাড়া দিয়া পাণ্ডার সহিত দ্বিতলে গেলাম। পাণ্ডা বলিলেন সেই বাড়ী হনুমান প্রসাদ ছ'ভাইয়ার। এই বাটীতে আমার বাসা দেওয়া হইল। আমি হাতের গাঁটরি ফেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম। কি সুন্দর! পূর্ব্বে সরযূ প্রবহমানা। তাহার জলরাশির উপর বালসূর্য্যের হেমরশ্মি ক্রীড়া করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ গুলি আনন্দে নৃত্য করিতেছে, প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ-ধারা তাহাদের গাত্রে ঢলিয়া পড়িতেছে। পবিত্রতায় পবিত্রতা মিশিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বাকাশে প্রকাণ্ড থালার ন্যায় লোহিত ভানু

কাঁপিতেছে। সরযূর ওপারে, বহুদূরে পর্ব্বতশ্রেণীর কাল-রেখা দিগন্ত ব্যাপিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে। অদূরে বটবৃক্ষে পালে পালে হনূমান্ খেলা করিতেছে। এই ত রামের অযোধ্যা! সরযূ-গমনের ঐ পথে আমাদের রাম লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই স্নানের জন্য কখনও না কখনও সরযূ গিয়াছিলেন, ঐ পূত বালুকা-কণা কত পবিত্র! ঐ সরযূ-সলিলে পরম-সতী মা-জননী সীতাদেবী কখনও না কখনও স্নান করিয়া-ছেন, ঐ সরযূর সলিলকণা কত পবিত্র! ঐ হনূমানেরা সেতুবন্ধনের সহায়তা করিয়াছিলেন, উহাঁরা রামসীতা ভিন্ন জানেন না, হনূমান্ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন রামচন্দ্র ব্যতীত তথায় অন্য কাহারও স্থান নাই। উঁহারা সীতারামের কত প্রিয়! ভক্তিভরে কক্ষ মধ্যেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। উঠিতে ইচ্ছা হইল না, বহুক্ষণ পড়িয়া রহিলাম।

(২)

প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া স্নান করিবার জন্য সরযূ অভিমুখে যাইতে লাগিলাম। কিছুদূর বালুকার উপর দিয়া যাইতে হইল। বোধ হয় এই বালুভূমির উপর দিয়া এক দিন সরযূর প্রবাহ বহিত। যদি তাহা হয় তাহা হইলে সরযূ নিশ্চয়ই একদিন বড় নদী ছিল।

ছাইভস্ম।

"লক্ষ্মণ-ঘাটে" উপস্থিত হইলাম। এই স্থানেই কি "লক্ষ্মণ-বর্জ্জন" হয়? এই স্থানেই কি হিন্দুর সত্যপালনের কঠোর ভ্রাতৃ-বর্জ্জন সম্পাদিত হইয়াছিল! বাল্যের সখা, বনবাসের একমাত্র সহায়, সীতা-উদ্ধারের প্রধান অবলম্বন, রাজ্যপরিচালনের পরম মিত্র, একান্তানুগত ভ্রাতা, বীর লক্ষ্মণকে কি ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র এই স্থানেই বর্জ্জন করিয়াছিলেন? আজ দু'পয়সার জন্য আমরা মিথ্যা বলি, আজ সামান্য কারণে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, আর একদিন সত্যের জন্য, প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য রামচন্দ্র সরযূতটে কি কঠোর কর্ত্তব্যই সাধন করিয়াছিলেন? আবার কি সে দিন আসিবে, আবার কি আমরা সেইরূপ সত্যপালন, সেইরূপ প্রতিজ্ঞা-রক্ষা শিক্ষা করিব? আজ যদি সেইরূপ সত্যপালন করিতে আমরা সমর্থ হইতাম তবে আমাদের অনুষ্ঠানগুলির এতাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিত কি? যাহার ভিত্তি ধর্ম্মের উপর স্থাপিত নহে, যাহার ভিত্তি চরিত্রবলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নহে,—যাহার ভিত্তি বাক্‌চাতুর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত,—তাহা কয়দিন থাকিতে পারে? প্রবল-বাত্যা-তাড়িত তরঙ্গমালা বালুকার বাঁধ ধ্বংস করিয়া ফেলে, কঠোর পর্ব্বত-গাত্র হইতে প্রতিহত হইয়াই ফিরিয়া আইসে। যখন আমরা আবার হিন্দু হইব, আবার আর্য্যোচিত সত্য-পালন

শিখিব তখনই আমরা বিজয় লাভ করিব। যাবৎ তাহা না হইবে তাবৎ অসার চীৎকার, সাময়িক উত্তেজনা বিশেষ স্থায়ী সুফল প্রসব করিবে না।

লক্ষ্মণ-বর্জ্জনরূপ কঠোর সত্যপালনের শোকপূর্ণ, মধুর কথা চিন্তা করিতে করিতে সরযূ-সলিলে অবতরণ করিলাম। চারি পার্শ্বে কত কচ্ছপ ভাসিতে ছিল। পদতলে কচ্ছপ লাগিতে লাগিল, তাহারা পদতল হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল।

আমি নদীতীরের লোক, কিন্তু কচ্ছপকে এমনভাবে বেড়াইতে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। ইহারা কাহাকেও কিছু বলে না। তীর্থ-মাহাত্ম্য। শুনিয়াছি এবং সংস্কৃত গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, তপোবনে সিংহশিশু মুনিতনয়ের সহিত ক্রীড়া করে, তপোবনে ব্যাঘ্র এবং হরিণ একসঙ্গে খেলা করে। এই ত তাহার নিদর্শন! যাহারা পবিত্র-সরযূ-সলিলে নিত্য সর্ব্বক্ষণ বিচরণ করে তাহারা কি কখন হিংস্র হইতে পারে? আবার কি ভারতে তপোবন হইবে, আবার কি বাঘে হরিণে খেলা করিবে? আবার কি বালকে সিংহের মুখ ব্যাদান করিয়া তাহার দাঁত গণিবে!! হিন্দুর আদর্শ অতি মহৎ ও উজ্জ্বল। সর্ব্ব প্রকার পার্থিব বিভবের অধীশ্বরী, মণি-মুক্তা-হীরকময়ী, বিচিত্র-পরিচ্ছদ-ধারিণী সসাগরা-বসুন্ধরা-রাণী, মহীয়সী পাশ্চাত্য-সভ্যতা-

সুন্দরী বলেন "অনাহার-ক্লিষ্ট, বসন-ভূষণ-পরিশূন্য, ধনরত্ন-হীন, অবহেলিত, ঘৃণিত হিন্দুর লাঞ্ছনা তাহার কুহেলিকা-পরিবৃত সাধনাতীত আদর্শের অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল।" তিনি দয়া করিয়া উপদেশ দেন "যে আদর্শ লাভ করা যায় না সে আদর্শ ত্যাগ কর; যাহা লাভ করা যায় তাহার সাধনা কর, মঙ্গল হইবে।" দীনহীনা, বসন-ভূষণ-বিহীনা, নিরাভরণা হিন্দু-সভ্যতা আপনার হেট মুখ উচু করিয়া প্রায়ই কথা বলে না, কিন্তু সময় সময় তাহার মনে হয় "গৌরবময়ি! আমাকে উপদেশ দিলে বলিয়া তোমাকে শত ধন্যবাদ দিতেছি, আমার শ্রদ্ধা ভক্তি গ্রহণ কর; তোমার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকুক। তুমি এক্ষণে ভোগ বাসনায় মুগ্ধা, আমার কথা অধুনা তোমার ভাল লাগিবে না। যখন তোমার অবসাদ আসিবে, প্রমোদ-কাননের নৃত্য-গীত যখন তোমার ভাল লাগিবে না তখন আমার কথা তোমার মনে উঠিবে, তখন তুমি বুঝিবে যে, যে অমূল্যধন সুদুর্লভ সেই সাধনার ধনই আমাদের একমাত্র উপাস্য, আরাধ্য, লক্ষ্য হওয়া উচিত, তখন তুমি বৈরাগ্যের মহিমা খুঁজিবে। হিন্দু-আদর্শ বুঝিবার শক্তি, সাধনা ব্যতীত লাভ হয় না। বহু জন্মের সাধনা বলে হিন্দু-আদর্শ বুঝিবার শক্তি জন্মে।

স্নান করিয়া আর্দ্র বসনে সরযূ-সলিলে সচন্দন পুষ্প ও

দুগ্ধ ভাসাইয়া দিলাম। অশ্রুধারায় গণ্ডদেশ ভাসিতে লাগিল; আমি কিছু জানি না, আমি কিছু বুঝি না, আমার ভক্তি নাই এই দুঃখে অন্তর বিদীর্ণ করিয়া গভীর বেদনা উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। সাশ্রু নয়নে পশ্চাৎ দিকে চাহিতে চাহিতে বাসায় ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম। প্রাণে বাজিতেছিল "সরযূ, সরযূ, সরযূ।"

(৩)

সরযূতটে ভ্রমণ করিয়া, সরযূ-সলিলে স্নান করিয়া, সরযূর জলে চাঁদের আলোর খেলা দেখিয়া, সরযূর সহিত মনের কথা বলিয়া, রামচন্দ্রের বাড়ী, দশরথের কিল্লা ইত্যাদি দেখিয়া দিন কাটাই। একজন ব্রাহ্মণ রন্ধন করিয়া দেন; সময়ে হউক আর অসময়ে হউক, ভাল হউক আর মন্দ হউক, সেই অন্ন ব্যঞ্জন আহার করি।

আমার তীর্থ-পুরোহিত, পাণ্ডা হনূমান প্রসাদের যে প্রকাণ্ড অট্টালিকার এক কক্ষে আমি বাস করিতাম সেই অট্টালিকার আমার কক্ষ সমীপস্থ দুই তিনটী কক্ষ লইয়া একটী বাঙ্গালী পরিবার অবস্থিতি করিতেছিলেন। বিদেশে সহজেই বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় এবং ভাব হয়। আমাদেরও তাহাই ঘটিল। দু'একদিনে আমার সহিত এই বাঙ্গালী পরিবারের বিশেষ পরিচয় হইয়া গেল। আমি

ব্রাহ্মণবংশজাত, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। মেয়েরা বলিলেন "তুমি একাকী কষ্ট করিয়া অমন আহারাদি কর কেন? আমাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া কল্লে পার। আমরা তাতে খুব সুখী হ'ব।" আমি বলিলাম "আমার বিশেষ কোন কষ্ট নাই। দু' চার দিন যা' এখানে থাকিব তা এমনভাবে থাকিলেই কাটিয়া যাইবে।" তখন স্নেহময়ী রমণীগণ এবং স্নেহময় পুরুষগণ, উভয় দলে মিলিয়া, আমার প্রতি মধুর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। একটী বালক আমাদের বিচারের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা না করিয়া ছুটিয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। আমার মাল পত্র, আসবাব এক হাতে করিয়া ছুটিয়া ফিরিল। মাল পত্র আর কি? একখানি কাপড়, একখানি গামছা, একটী চাদর, একটী পেন্সিল এবং একখানি ছোট খাতা। এই মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভার একখানি নেকড়ায় বাঁধা ঘরের কোণে পড়িয়াছিল। বালক এই আসবাব লইয়া আসিল। আমার বাসা পরিবর্ত্তিত হইল। আমার ঘরকন্না উঠিল। একটী বালক একলম্ফে আমার জীবনের এই মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত করিল।

বালক বালিকারা কাঁধে পিঠে চড়ে। মেয়েরা আদর যত্ন করিয়া ভাল ভাল দ্রব্য খাওয়ান। পুরুষেরা হাস্য আমোদে আমার অবসরমত আমাকে পরিতুষ্ট করেন।

নির্ম্মাল্য।

আমি আজ এই বাঙ্গালী পরিবারের একজন। এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কতবার যে এইরূপে কত বিভিন্ন পরিবারের "একজন" হইয়াছি তাহা আর কি বলিব! হে সহৃদয় বিদেশী ভ্রাতৃগণ, অয়ি করুণাময়ী বিদেশিনী ভগিনীগণ, কতকাল চলিয়া গিয়াছে, তোমাদের স্নেহ-প্রীতি-সমুজ্জ্বল চাঁদমুখ দেখি নাই, তোমাদের শান্তিময় আশ্রমে আদরের অতিথি হইয়া তোমাদের স্নেহ-করুণা-মধুর খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিয়া ধন্য হই নাই, কর্ম্মস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ এই শৈলশিখরে, কাল ঐ সমুদ্রবক্ষে পরশ্ব ঐ মরুমাঝারে ঘুরিতেছি,—হয়ত সারাবৎসরেও একবার তোমাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করি না, কিন্তু তাই বলিয়া কি ভাই, কিন্তু তা' বলিয়া কি বহিন্, তোমাদের সেই আদর যত্ন বিস্মৃত হইয়াছি? তোমাদের সেই শান্তিময় আশ্রয় ভুলিয়া গিয়াছি? তোমাদের সেই চন্দ্রানন, সেই মধুর অধরের মৃদু হাসি কি নয়ন হইতে অপসৃত হইয়াছে? না, ভাই, আমি তোমাদিগকে ভুলি নাই। না ভগিনি, আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হই নাই। সেই বিদায়ের দিনে, সেই বিদায়মুহূর্ত্তে, যখন "আসি তবে" বলিয়া তোমাদের নিকট বিদায় চাহিতাম তখন তোমাদের মুখমণ্ডল যে গভীর-বিষাদ-অন্ধকারে আবৃত হইত সেই অন্ধকার আজিও

আমার নয়নপথাতীত হয় নাই, তখন তোমরা নীরবে যে রোদন করিতে সেই বেদনাপূর্ণ নীরব রোদন আমার মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কিত হইয়া আছে--সেই পবিত্র নয়নজল আমার প্রতি শোণিতবিন্দুতে মিশ্রিত হইয়াছে, যাবৎ আমার ধমনীতে শোণিতপ্রবাহ বহিবে তাবৎ ভাই, তাবৎ বহিন্, তোমাদের পুণ্যস্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিবে। তোমরা জানিতে আমি বিদেশী, তোমরা জানিতে —ঘুরিতে ঘুরিতে আজ তোমাদের আশ্রমে আসিয়াছি কাল আবার অন্যত্র চলিয়া যাইব, তোমরা জানিতে—জীবনে আর কখনও হয়ত আমার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে না তবুও এই নিষ্ঠুর পাষাণের প্রতি তোমাদের এত স্নেহ, এত মমতা! তোমাদিগকে ভুলিব কেমন করিয়া? এই বিশ্বে যাহা কিছু সুন্দর মধুর সকলই আমার আদরের। অরুণোদয়ে পূর্ব্বাকাশের মনোহারিণী শোভা, দিনান্তে পশ্চিমগগনের মধুরিমা, জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমার সৌন্দর্য্যসম্ভার, তারকাকিরীটিনী অমানিশার সুষমা, চিত্রবিচিত্র-মৃগ-ময়ূর-সম্বর্দ্ধিত মহামহীধর-মহিমা, কল্লোলময়ী, স্রোতস্বিনীর সৌন্দর্য্য,সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়সহায়,অসীম বারিধির গাম্ভীর্য্য—যেমন আমার চিরসহচর চিরসহচরী, তোমারাও আমার তদ্রূপ চিরসহচর চিরসহচরী, যখন যে স্থানে যে অবস্থায় থাকিনা

কেন তোমরা আমার সঙ্গে থাক—এই দেখ আমার এই ভগ্ন কুটীরে আমার আসনের চতুর্দ্দিকে তোমরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছ,—তোমাদের নয়নে সেই স্বর্গীয় প্রীতি, তোমাদের অধরে সেই ত্রিদিবের হাসি। তোমরা দেব, দেবী। আসন পরিত্যাগ করিয়া সাষ্টাঙ্গে আমি তোমাদিগকে প্রণাম করিতেছি; আশীর্ব্বাদ কর দেব, আশীর্ব্বাদ কর দেবি, আমি যেন তোমাদেরই তুল্য হই!

(৪)

কিছুদিন হইতে স্বভাবটা কেমন "একাষেঁড়ে" হইয়া গিয়াছে। একাকীই থাকি ভাল। তাই ভ্রমণের সময় একাকী ভ্রমণ করি। যেস্থানে বসিতে ইচ্ছা হয় দু'দণ্ড বসি। যেস্থানে বৃক্ষপত্রান্তরাল হইতে পাখীর মধুর কাকলি বায়ুস্রোতে সঙ্গীত-তরঙ্গ তুলিতে থাকে সেস্থানে যতক্ষণ প্রাণ চায় ততক্ষণ দাঁড়াই। যেস্থানে নদীর স্বচ্ছ সলিল উপলখণ্ডের উপর দিয়া ঝিক্‌মিক্ করিয়া বহিয়া যায় সেস্থানে বসিয়া ভাবি অমন নির্ম্মল হৃদয় পাইব কি? সন্ধ্যার আগমনে যখন ভূমণ্ডল অন্ধকার আবরণে বেষ্টিত হইতে থাকে তখন ভাবি জীবনসন্ধ্যারও ত স্বভাব এই। বৃক্ষের লোহিতাভ কিসলয়ে তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ খেলিতে দেখিলে অনেক সময় নৃত্য করি। অন্য কেহ সঙ্গে থাকিলে ইচ্ছামত

বসা দাঁড়ান যায় না। অন্য লোকের সম্মুখে আবার লজ্জা করে। যে সবুজ বৃক্ষপত্রটী যত্নে ঝাড়িয়া চুম্বন করি অন্য কেহ সঙ্গে থাকিলে সে পত্রটী চুম্বন করিতে পারি না, সে কি মনে করিবে? যে কথাটী মনে আসিলে নাচ পায় সে কথাটী মনে আসিলেও নাচিতে পারি না, লোকে মনে করিবে এত বাড়াবাড়ি কেন? শূন্যে যে আলাপ করি, অন্যের সম্মুখে নীলাকাশের সহিত সে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে পারি না, মনে করিবে লোকটা পাগল নাকি? এইরূপ নানা কারণে অনেকদিন হইতে একাকীই থাকি ভাল, একাকীই ভ্রমণ করি। অযোধ্যায়ও একাকী বেড়াই।

আমি যাঁহাদের সঙ্গে থাকি আমার সঙ্গে তাঁহাদের ভ্রমণ করা ঘটিয়া উঠে না। তাঁহারা প্রায়ই বেলা পড়িলে ভ্রমণ করিতে বাহির হয়েন। প্রত্যহই একজন না একজনকে বাসায় থাকিতে হয়, কারণ তাঁহাদের আসবাব অনেক, ভয়—পাছে চুরি যায়, হনুমানে লইয়া যায়। দু'একদিন আমি জোর করিয়া বাসায় থাকি, তাঁহারা সকলে একসঙ্গে বেড়াইতে যান। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি এই পরিবারের কেহই অপরাহ্ণে বাসায় থাকিতে চাহেন না, সকলেরই ইচ্ছা বেড়াইতে যাওয়া। কিন্তু একটি রমণী নিত্যই বাসায় থাকিতে চাহিতেন, অধিক দিন

তিনিই বাড়ীতে থাকিতেন। রমণীর বয়স এখনও ত্রিশ বৎসর হয় নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জননী ও কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত অযোধ্যায় আসিয়াছেন। এই বাঙ্গালী পরিবারের সকলেই যেন একটু তরল। হাস্যরহস্য, অকারণসঞ্জাত আনন্দ-কোলাহল ইত্যাদি তরল আমোদে তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই রমণীকে কখনও চপলতা করিতে দেখি না। মুখে চাঞ্চল্য বা তরলতা নাই, দুঃখ বা বিষাদ নাই; কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক, কেমন যেন উদাস ভাব। আমি তাঁহাকে দিদি বলি। দিদির সহিত আমার নূতন পরিচয়, সুতরাং কৌতূহল হইলেও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না। কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করি, "তোমার বুড়ী মা হাসিতে-ছেন, তোমার বড় ভাই রাগ করিতেছেন, তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী ত রঙ্গরহস্য তরলতা ছাড়া জানেন না, তবে তুমি অমন কেন?"

একদিন দ্বিপ্রহরের সময় বাহিরে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিলাম। দ্বিতলে উঠিয়াই বুঝিলাম সকলে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। কারণ, মহাকোলাহল ত হইতেছে না, হাসির রোল ত উঠিতেছে না। ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, একটী

পুটলী খুলিয়া দিদি কি দেখিতেছেন। আমার পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়াই "দাদা যে আজ এত সকালে ফিরেচ?" বলিতে বলিতে পুটলী বাঁধিয়া তাঁহার পেটিকায় রাখিলেন। আমি বলিলাম, "হ্যাঁ দিদি, ক্ষিধে পেয়েচে, তাই এসেচি।" দিদি তাড়াতাড়ি খাবার ও জলের ঘটী আনিয়া যত্নের সহিত খাওয়াইলেন। আমার মনে হইতেছিল, "দিদি কি করিতেছিলেন? আমাকে দেখিয়া লুকাইলেন কেন? বোধ হয় ছেঁড়া কাপড়ের কাঁথা প্রস্তুত করিতেছিলেন,—তা' ছিন্ন কাপড়গুলি ভয়ে ভয়ে পেটিকায় তুলিয়া রাখিলেন কেন?" মুখ ফুটিয়া কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। বাড়ীতে অপর কেহ নাই দেখিয়া জল খাইয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হনূমানের খেলা দেখিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যে দাদা, মা ও ভগিনী হাসিমুখে ফিরিয়া আসিলেন। দাদার হাতে এক ঠোঙ্গা লুচি। অযোধ্যার লুচি সকল বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত নহে। কাল, বড় মোটা। আমাকে দরজায় দেখিয়া দাদা বলিলেন "কি গো, আজ যে এর মধ্যেই ফিরেচ? রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌চ? রোজই ত হনূমান দেখ। ওর আর কি দেখ্‌চ? লুচি এনেছি, বেশ লুচি গো, খাবে এস।" এই কথা বলিয়া দাদা আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া

দ্বিতলে উঠিতে লাগিলেন। এত আদর যত্ন কি উপেক্ষা করা যায়? কাহারও মিষ্ট কথা কখনও অনাদর করিতে পারি না। সংসারে যথার্থ স্নেহ মমতা অত্যন্ত বিরল। যে স্থানে এক বিন্দু স্নেহ পাই সে স্থানে প্রাণ গলিয়া যায়। লুচির লোভে যত হউক আর নাই হউক, আদরের লোভে দাদার সহিত উপরে উঠিলাম। আমাদের পদ-শব্দে এবং কোলাহলে দিদি আসিয়া ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন। দাদা বলিলেন, "নে ত বোন্, লুচি ভাগ কর। সকলে খাওয়া যাক্।" ম্লান হাস্যের ক্ষীণ জ্যোতিঃ মুখে ফুটিতে যাইয়া গাম্ভীর্য্যে বিলীন হইয়া গেল। দিদির অন্য কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। পরম যত্ন করিয়া দিদি আমা-দিগকে লুচি ভাগ করিয়া খাওয়াইলেন।

(৫)

দুইদিন পরে সরযূর ওপারে গিয়াছিলাম। লক্ষ্মণ এই সরযূ পার হইয়া সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের আদেশে বনবাস দিয়া আসিয়াছিলেন। মিথিলাধিপতি জনকের নন্দিনী, অযোধ্যার ঈশ্বর দশরথের পুত্রবধূ, শ্রীভগবানের আদরিণী প্রেয়সী, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-দেবীকে লক্ষ্মণ কোন স্থানে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সন্ধান করিয়া কিছুই ঠিক করিতে

পারিলাম না। যেন চতুর্দ্দিকে মহা বিষাদের ছায়া ছড়াইয়া রহিয়াছে, যেন সে দুঃখবার্ত্তা প্রকৃতিদেবী আজিও বিস্মৃত হয়েন নাই। সরযূতীরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, হয়ত এইস্থানে বসিয়া, অযোধ্যার দিকে চাহিয়া "রাঘববাঞ্ছা" কত অশ্রুই বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সতীর পবিত্র অশ্রু হয়ত সরযূ-প্রবাহে মিশিয়াছে। বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। গভীর বেদনা বুকে করিয়া সরযূর জল ভক্তিভরে মস্তকে দিলাম। আশা, যদি সতীর পবিত্র নয়নজল স্পর্শে পাপীর পাপ বিমোচন হয়!

জানকীর জীবন বাস্তবিকই দুঃখের জীবন। যেদিন হইতে রামচন্দ্রের সহিত সীতার ভাগ্য বিজড়িত হয় সেই দিন হইতে অন্তর্দ্ধানের দিন পর্য্যন্ত সতী কেবলই কাঁদিয়াছেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই পরশুরামের সহিত রামের যুদ্ধ, সীতার প্রাণ এই যুদ্ধের সময় কতই না কাঁদিয়াছিল! তাহার পর অভিষেকের প্রারম্ভেই বনবাস। জনকের ঐশ্বর্য্যময় অবরোধে সুখ-পালিতা বালিকা কেবল স্বামী-মুখ সন্দর্শন করিয়াই বনবাস-ক্লেশ সহিয়াছিলেন! তাহার পর রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ। সীতার আর্ত্তনাদে তরুলতা কাঁদিয়াছিল। তাহার পর স্বর্ণলঙ্কার অশোক-কাননে বাস। সে ত শোকের একশেষ! তাহার পর

অগ্নি-পরীক্ষা। সতী লজ্জায় ঘৃণায় মরমর হইয়াছিলেন! তাহার পর অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বর্জ্জন। রামের সন্তান জঠরে আছে বলিয়া সীতা জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন! তাহার পর লবকুশের যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণ-বধ। সীতার পাষাণ বুক আর কত সহিবে! তাহার পর সভাস্থলে পুনরায় পরীক্ষার প্রস্তাব। রমণীর প্রাণ আর কত সহিবে, সর্ব্বসন্তাপহারিণী ধরিত্রী আপনার আজন্মদুঃখিনী তনয়াকে অঙ্কে লইয়া প্রস্থান করিলেন; রাম-বিরহে সতীর প্রাণ ফাটিল! কে বলে পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ! পার্থিব সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্যের পরিচায়ক নহে। তবে পাপ পুণ্যের পার্থক্য পাপী বা পুণ্যাত্মার প্রাণে। দুঃখে পুণ্যাত্মার যে সুখ, সুখে পাপীর তদধিক দুঃখ। ইহা অনুভব করিবার কথা, বুঝাইবার কথা নহে। এস ভাই, দুঃখে ভীত না হইয়া পুণ্যের জন্যই পুণ্যপথে ধাবিত হই।

"ঐহিকের সুখ হ'ল না বলিয়ে,
সে নাম কি তুই রহিবে ভুলিয়ে?"

জন্মদুঃখিনী সীতার দুঃখ-কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে সরযূ পার হইয়া অযোধ্যার পারে আসিলাম। অন্যমনে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিলাম। মুখ দেখিয়া দিদি

জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, তোমার মুখ আঁধার কেন?" উচ্ছ্বাসভরে কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার এই বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া দিদি নীরব হইয়া রহিলেন। দেখিলাম এই রমণী শোকের স্বভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহেন। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে সান্ত্বনা-বাক্য প্রয়োগ করিলে শোক বাড়িয়া যায়। এমন অবস্থায় কিছু না বলিয়া নীরব থাকিলে প্রকৃত সহানুভূতি দেখান হয়। বাঙ্গালীর মেয়ে মানবহৃদয়ের এই তত্ত্ব জানেন এই প্রথম দেখিলাম। আমি একটু প্রকৃতিস্থ হইলে দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?" "ওপারে সীতা-পরিত্যাগের স্থান অনুসন্ধান করিতে যাইয়া সীতার দুঃখ-স্মৃতিতে হৃদয় বড়ই কাতর হইয়াছে। কেবলই মনে হইতেছে, সীতা বড়ই দুঃখিনী।" এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে আবার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু-প্রবাহ বহিল।

এই দিন হইতে আমার প্রতি দিদির স্নেহের আধিক্য দেখিলাম।

(৬)

পুণ্যধাম বারাণসীর * * * অগস্ত্যকুণ্ডে বাস করেন। কথা-প্রসঙ্গে আমার অযোধ্যাদর্শনেচ্ছা জানিতে পারিয়া তিনি মণিপর্ব্বত দেখিতে বলিয়াছিলেন। মণিপর্ব্বতে তখন

নির্ম্মাল্য।

একশত-তুই-বর্ষ-বয়স্ক একজন সাধু ছিলেন। সাধুর চরণ-দর্শনেচ্ছা চিরদিনই প্রবল। একদিন দিবাবসানে মণিপর্ব্বতে যাইবার জন্য একাকী বাহির হইলাম। পথে আসিয়া লোকের নিকট শুনিলাম, মণিপর্ব্বত দূরে। সন্ধ্যা আগত-প্রায় দেখিয়া একখানি গাড়ী করিলাম। যখন মণিপর্ব্বতের পাদদেশে পহুঁছিলাম তখন ঘন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মণিপর্ব্বতের চতুষ্পার্শস্থ নিবিড়ারণ্যে সন্ধ্যার আঁধার নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। একজন মাত্র পথ-প্রদর্শক-সমভিব্যাহারে মণিপর্ব্বতে আরোহণ করিলাম।

পর্ব্বত-চূড়ায় মন্দির। মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরে সীতারামের আরতি হইতেছিল। ধীর সমীরণে প্রবাহিত হইয়া পবিত্র ধূপের গন্ধ প্রাণে প্রবেশ করিতে লাগিল। শান্ত সন্ধ্যায়, শান্তিময় স্থানে, সাত্ত্বিক ধূপামোদে প্রাণ শান্তিলাভ করিল।

দেবারতি সম্পন্ন হইলে মন্দির-প্রবেশের অনুমতি পাই-লাম। ধীরে ধীরে, সংযতচিত্তে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। দীপালোকে সীতারামের পবিত্রমূর্ত্তি জ্বলিতেছিল। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। শ্রীশ্রীসীতারামের চরণকমল বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম। মনের কথা চরণসরোজে নিবেদন করিলাম।

ছাইভস্ম।

শ্রীশ্রীসীতারামের চরণতলে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সেবক সাধুর চরণবন্দনার বাসনা জানাইলাম। একখানি ক্ষুদ্র, মলিন বসন জড়ান, এক অতিবৃদ্ধ আসিলেন। একপ্রকার নগ্নাবস্থা। প্রণাম করিলাম। সাধুর দৃষ্টিশক্তি বয়সে হীন হওয়ায় তিনি হস্ত-চালনা দ্বারা আমি কোন স্থানে আছি তাহা ঠিক করিয়া লইয়া দু'হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মুখে ফুটিতেছিল, "রাম কহ, রাম কহ।" বৃদ্ধের ভক্তিস্রোতে আমার পাষাণ হৃদয় গলিল। আমি তাঁহার চরণযুগলে মস্তক রাখিয়া রাম নাম করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ এইভাবে কাটিল। তাহার পর অন্যান্য কথা হইল। শেষে সাধুর চরণে বিদায় লইয়া, সীতারামের চরণে প্রণাম করিয়া পর্ব্বতগৃহ হইতে বাহির হইলাম।

মাথার একটু উপরে চাঁদ হাসিতেছিল। দুই একটী নক্ষত্র দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। অদূর-তরুশিরে চন্দ্রালোক ঝক্ মক্ করিতেছিল। দূরে সরযূর ক্ষীণ প্রবাহ অযোধ্যা বেড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে—সরযূর সলিলে চাঁদের কিরণ মিশ্রিত হওয়ায় সরযূ গলিত-স্বর্ণ-প্রবাহ-সম হাসিতেছিল। প্রাণে বিমল আনন্দ ছুটিল। পর্ব্বত-চূড়ায় দাঁড়াইয়া নিসর্গের শোভা দেখিতে দেখিতে এবং বিবাহের পর অযোধ্যায় আসিয়া রামের সহিত মণিপর্ব্বতে

সীতার দোলনায় দোলার কথা ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইলাম। জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। রাম-সীতা যেন চক্ষের উপর ভাসিতে লাগিলেন। উর্দ্ধে কৌমুদীরাশি পুঞ্জীভূত হইয়া সীতারামের দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল, সেই দিব্যমূর্ত্তি গলিয়া পুনরায় কৌমুদী-রাশিতে পরিণত হইতে লাগিল। শান্তির শত প্রস্রবণ হৃদয়-কন্দর হইতে প্রবাহিত হইল। আবেশে, অবশ দেহে, পর্ব্বতশিখরে বসিয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিল বলিতে পারি না। পথ-প্রদর্শকের কণ্ঠস্বরে জ্ঞান ফিরিল। সে বলিতেছিল "বাবু, রাত অনেক হ'য়েছে, চলুন, বাড়ী যাই।" বাড়ী আর কোথায় ছাই! এই ত বাড়ী। এই স্থান ছাড়িয়া যে স্থানে যাইব সে কি আর বাড়ী! হায়! জীবনে কি এমন দিন কখন আসিবে যখন এমনই স্থানে এমনই ভাবে চিরদিনই কাটিবে! বাস করি ত কলিকাতায়, মাঝে মাঝে অন্যত্র যাই। পর্ব্বত-শেখরে, গহন কাননে, নদী-বক্ষে, সমুদ্রকূলে কোথায়ও স্থির হইতে পারিতেছি না। এই যে কলিকাতায় অবস্থিতি—ইহাও অত্যন্ত অপ্রীতিকর। তবুও এখানে থাকিতে হইতেছে। বাল্যে কর্ম্মদোষে সুশিক্ষা লাভ করি নাই, কষ্টসহিষ্ণু হই নাই, শীতোষ্ণ

সুখ-দুখ সমভাবে গ্রহণ করিবার শক্তি শরীরের নাই, এখন ইচ্ছা করিলেই ইচ্ছামত স্থানে নিয়ত বাস করিতে পারি না। যদি দয়া করিয়া দয়াময়ী কখনও ফাঁস কাটিয়া দেন তবে তাঁহার সংসারের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারিব, নতুবা এই দুঃখ সহিতে হইবে।

পথপ্রদর্শকের আগ্রহাতিশয্যে ধীরে ধীরে পর্ব্বতাবরোহণ করিয়া নিম্নভূমিতে আসিলাম। নিকটেই গাড়ী ছিল, গাড়ীতে চড়িলাম। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হৃদয়ে চাপিয়া বসিয়া রহিলাম। গাড়ী দ্রুত চলিয়া অযোধ্যার লোকালয়ে প্রবেশ করিল। সাশ্রুনয়নে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলাম। মণিপর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজি দূরে অদৃশ্য হইয়াছে। পর্ব্বতশিখরে এখনও চাঁদ তেমনই হাসিতেছে। এখনও তারকা তেমনই জ্বলিতেছে। কি সুন্দর! যাবৎ এ পৃথিবীতে রহিব তাবৎ এ সুখস্মৃতি বিস্মৃত হইব না।

গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। গভীরভাবপূর্ণ হৃদয়ে, নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে দ্বিতলে উঠিলাম। গৃহ নিঃশব্দ। কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইয়া দেখি, প্রদীপের আলোকে দিদি বসিয়া অত্যন্ত মনঃসংযোগের সহিত কি দেখিতেছেন। লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, সেই পুটলী। আজ তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আমার ধীর-পদবিক্ষেপ-শব্দ তাঁহার

কাণে পহুঁছায় নাই। দাঁড়াইয়া দেখিতেছি এমন সময় দিদি আমাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি পুটলী বাঁধিবার উপক্রম করিলেন। আমি ছুটিয়া যাইয়া তাঁহার হাত ধরিলাম। বলিলাম, "দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, নিত্য বাড়ী বসিয়া একটা পুটলী খুলিয়া কি দেখ? সকলে আমোদ আহ্লাদ করিয়া যখন বেড়াতে যায় তখন নির্জ্জন পাইয়া একাকী তুমি কি কর আজ তাহা আমাকে বলিতে হইবে।" হাত ছাড়িয়া পা ধরিলাম। দিদির হৃদয় তখন উচ্ছ্বাসময়। তাঁহার নয়নজল টপ্ টপ্ করিয়া আমার হস্তে পড়িতে লাগিল। নীরবে আমার হস্ত ধরিয়া তাঁহার চরণ সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "কি শুনিবে ভাই? আমি দুঃখিনী। আজ চারিবৎসর হইল আমার "অশ্রু" চলিয়া গিয়াছে, আমি হতভাগিনী আজও বাঁচিয়া আছি। এই দেখ তাহার জুতা, এই দেখ এখনও তাহার জুতায় ধুলা লাগিয়া রহিয়াছে। এই জুতা চারি বৎসর পূর্ব্বে আমার একবৎসরের মেয়ে "অশ্রু" পরিত। সে আজ চারি বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আমি জুতার ধুলা ঝাড়ি নাই। (দিদির চক্ষু হইতে শ্রাবণের ধারা বহিতেছিল; মায়ের পবিত্র স্নেহ-বারিধারা জুতায় পড়িয়া আমার হাতে পড়িতেছিল। আমার দেহ পবিত্র হইতে

ছিল)। এই দেখ তাহার গায়ের জামা। এই জামা ময়লা হইলেও আমি কাচি নাই। এই জামায় তাহার গায়ের ময়লা লাগিয়া আছে, কাচিলে ময়লা উঠিয়া যাইবে, তাহার দেহের ময়লা আর আমি গায় মাখিতে পাইব না। এই দেখ তাহার "চুষিকাটি"। তাহার মৃত্যুর সময় হারাইয়া গিয়াছিল, আমি কত খুঁজিয়া তাহার ভাঙ্গা "চুষিকাটি" বাহির করিয়াছি। এই দেখ তাহার দুধ খাওয়ার ভাঙ্গা ঝিনুক। আমি এই ঝিনুক আজিও মাজি নাই, তাহার দুধের গন্ধ পাছে চলিয়া যায়—এই বলিয়া জননী ঝিনুক শুঁকিতে লাগিলেন, যেন খুকির দুধের গন্ধ পাইতেছেন। চার বৎসর কি গন্ধ থাকে? কি জানি? হয়ত মায়ের ঘ্রাণশক্তি মৃতকন্যার দুধের ঝিনুকে চার বৎসর পরেও দুধের গন্ধ পাইয়া থাকে। জুতা, জামা, চুষিকাটি ও ঝিনুক বুকে লইয়া দিদি মেঝেয় শুইয়া পড়িলেন, আমি অবাক্ হইয়া পাশেই বসিয়া রহিলাম। আমার জননীর মৃত্যুকালে মায়ের প্রাণের পরিচয় কিছু পাইয়াছিলাম, আর আজও কিছু পাইলাম।

আসুন, পাঠক, আমরা জননীকে প্রণাম করি। পূজ্যপাদ, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর পূজনীয় শ্রীযুত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃভক্তির জন্য বিখ্যাত।

আজকাল মাতৃভক্তির স্রোতে কেমন ভাঁটা লাগিয়াছে, স্ত্রীর প্রতি আদরের ঢল্ নামিয়াছে। যাবৎ আমরা আবার জননীকে ভক্তি করিতে না শিখিব তাবৎ আমাদের মনুষ্যত্ব জাগিবে না। জননীর মূল্য বুঝি না, জন্মভূমির মর্য্যাদা রাখি কি প্রকারে?

এই ঘটনার পরদিন আমার অযোধ্যবাস শেষ হইল। সন্ধ্যার পরে দিদিদের নিকট বিদায় লইয়া, সরযূর কাছে বিদায় লইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে ষ্টেশনে আসিলাম। ষ্টেশনের নিকটে সেই তাল গাছের কাছে তেমনি করিয়া চাঁদ হাসিতেছিল, কালসাগরে যে কত চাঁদ ডুবিয়া গেল কে তাহার খোঁজ করে! তেমনই করিয়া চাঁদের সুধা ধারাকারে ষ্টেশ-নের গাছপালা ভাসাইয়া হাসিতেছিল। গাড়ী আসিলে উঠিয়া পড়িলাম। অযোধ্যা ও সরযূ দৃষ্টিপথে আর পড়ে না। মনে জাগিতেছে অযোধ্যা, সরযূ আর স্নেহময়ী জননী!

তোর কি এখন সময় ?

বৈশাখের সন্ধ্যায় সেদিন যখন শ্যামলফলসজ্জিত-নাতিদীর্ঘ-চূত-তরু-পরিশোভিত পল্লীকুটীর আঁধারাবৃত করিয়া গগনমণ্ডলে জলদজাল শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত হইতেছিল, তখন নবনীরদনিবদ্ধদৃষ্টি, আত্মহারা, দ্বাবিংশবর্ষবয়স্ক কনিষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চচত্বারিংশবর্ষবয়স্কা, স্নেহময়ী সহোদরা বিরক্তি-কর্কশস্বরে ভৎর্সনা করিলেন, "তোর কি এখন সময় ?"

ভগিনীর তীব্র চীৎকারে যুবকের বাহ্যজ্ঞান প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ঘনকৃষ্ণঘনাবলী হইতে সে তাহার সুনীল-তারকাশোভিত, কুবলয়নিভ নয়নযুগল অপসারিত করিয়া সহোদরার বিরাগ-বিকৃতবদনে সরলভাবে স্থাপিত করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে ভগিনীর আনন হইতে লোচন-দ্বয় উত্তোলন করিয়া তাহার প্রিয় মেঘমালায় আত্মহারা হইয়া সন্নিবেশিত করিল। কুলিশের কঠোর নির্ঘোষে রমণীর বিকট চীৎকার নিমজ্জিত হইল।

নবনীরদসন্দর্শনসঞ্জাতভাবোদ্দীপ্ত, নবনীরদনিন্দিত যুবকের মুখমণ্ডল স্ফুরদ্বিদ্যুদ্বিভায় আমার অত্যন্ত মধুর

লাগিতেছিল, কিন্তু অদৃষ্টদেবী যাহার ললাটে সুখ লিখেন নাই, সে সুখী হইবে কি প্রকারে? সহোদরকে অন্যমনস্ক, অচলবৎ অটল দেখিয়া সহোদরা সমীপস্থ স্বজন আমার নিকট রোষে-ক্ষোভে ভ্রাতার অন্যায় আচরণের বিষয় বলিতে লাগিলেন। বর্ষীয়সী পিতামহীর দুঃখকাহিনী মনোযোগসহকারে শ্রবণ না করিলে সদাচারবিগর্হিত ব্যবহার করা হইবে এই ভয়ে সদাচারে মনোযোগ প্রদান করিলাম। যুবকের রাগরঞ্জিত শ্যামবদন নিরীক্ষণ করিতে আর পাইলাম না। এ জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করিলাম। সকল কষ্টেরই কারণ যে স্বীয় অসদাচরণ তাহা ঠিক মনে হইতেছে না; প্রাণহীন, সামাজিক সদাচার তাহার কতকগুলির হেতু বলিয়া কখনও কখনও মনে হয়। হয়ত আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল! যাউক, সে কথার আবশ্যকতা নাই।

ধীরে ধীরে, একে একে, বিনাইয়া বিনাইয়া, রমণী-সুলভভঙ্গিতে ভগিনী ভ্রাতার দোষরাশি বিবৃত করিলেন। সে তাহার সমবয়স্ক যুবকদিগের ন্যায় সংসারধর্ম্মে মন দেয় না। ছলে, বলে, কলে, কৌশলে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার জননীসদৃশী সহোদরাকে অর্পণ করে না। যুবজনোচিত হাস্যকৌতুক ভালবাসে না। একাকী

পোড়ামুখ করিয়া তরুতলে, নদীতটে বসিয়া আপনমনে কি ভাবে! সুন্দরী কিশোরী কন্যার সহিত বিবাহের উদ্যোগ হইলে কাহাকে কিছুই না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা, আহ্নিক পূজা ইত্যাদিতে দিন রাত্রি অতিবাহিত করে। সেদিন অমাবস্যার রাত্রিতে রাঁধিয়া বাড়িয়া বসিয়া আছেন, ভ্রাতার দেখা নাই, অবশেষে রজনী তৃতীয় প্রহরে গৃহে ফিরিল। ভর্ৎসনা করিলেন, "এত রাত্রি পর্য্যন্ত কে তোর জন্য ভাত লইয়া বসিয়া থাকে?" উত্তরে স্মিতমুখে বলিল, "দিদি, আজ হইতে অমাবস্যার রাত্রিতে আর আমার ভাত রাঁধিও না।" এই মেঘ উঠিয়াছে, হাঁ করিয়া মেঘের প্রতি চাহিয়া বসিয়া আছে। এইরূপে সকল দুঃখ বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিলেন, "আর ভাই, বলিবই বা কি? আজ কয়েকদিন হইল এক বেটা সন্ন্যাসী নদীর তীরে বটতলায় আস্তানা করিয়াছে। সেই হতচ্ছাড়ার এখানে আসা অবধি পোড়ামুখোর আর চুলের টিকি দেখিবার উপায় নাই। তোমাদের ন্যায় সৎসঙ্গে পড়িত তবে উহার চক্ষুঃ ফুটিত। বল দেখি দাদা, এখন কি ওর সময়?"

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মনের যে অবস্থা ছিল আজ যদি

সেই অবস্থা থাকিত তাহা হইলে তখনই তখনই পল্লী-বাসিনী পিতামহীর প্রশ্নের সত্য হউক আর মিথ্যা হউক একটি উত্তর দিয়া স্বীয় বিচারশক্তির অমানুষিক স্ফুরণে বেশ একটু অহঙ্কৃত হইতাম। আজ সকল কথা শ্রবণ করিয়া নীরবই রহিলাম। একাকী এই দুর্য্যোগের রজনীতে ক্রোশার্দ্ধ-বিস্তৃত-প্রান্তরপথ অতিক্রম করিতে হইবে বলিয়া সবিনয়ে দিদির চরণে বিদায় লইলাম। অনতিদূরস্থ বনপথে প্রবেশ করিতে না করিতে অন্ধকার রজনী মুখরিত করিয়া ধ্বনিত হইল, "নবীন-নীরদনীলা, নগনা, কেরে নিতম্বিনী ?"

প্রায় একপক্ষ অতীত হইয়াছে। পল্লীবাস হইতে প্রবাসে আসিয়াছি। সেই সন্ধ্যার ন্যায় আজি এই সন্ধ্যায় আবার তেমনই করিয়া গগনমণ্ডলে মেঘলালা জমিতেছে। সহরে ইষ্টকগৃহগুলি পল্লী-পর্ণকুটীরের ন্যায় মেঘের ছায়ায় আঁধার হইয়া উঠিয়াছে। আজ এই আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আজ নিদাঘজলদ-জাল দেখিয়া দেখিয়া সেই সন্ধ্যার প্রশ্নের আলোচনা করিতেছি। শান্তভাব শক্তির সর্ব্বোচ্চ স্ফুরণ। যে সাধক শক্তির অনুশীলন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তিনি সেই নবনীরদ-সন্দর্শনে নিশ্চয়ই হৃদয়ের ধন হৃদয়ে ধরিয়া শান্ত

হইয়া বসিয়া আছেন। বাহ্যজগতের ঝঞ্ঝাবাত আজিও আমার হৃদয়দ্বারে আঘাত করিয়া আমাকে আলোড়িত করে, তাই এই সুখরজনী সুখসম্মিলনে অতিবাহিত না করিয়া সমালোচনায় নিরত আছি। উপায় নাই, যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, সে তাহার ফল ভোগ করিবে। তবে এই প্রশ্নের আলোচনার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহাও দেখিতেছি। সে কথা পরে বলিতেছি।

যদি পল্লীবাসিনী, অশিক্ষিতা পিতামহীর মুখেই "তোর কি এখন সময় ?" এই ভর্ৎসনা শ্রবণ করা যাইত, তাহা হইলে আলোচনা বিশেষ আবশ্যক হইত না। পল্লীবাসিনী, অশিক্ষিতা প্রাচীনার ভর্ৎসনা উপহাসের সহিত উড়াইয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু বহু "সুশিক্ষিত," গণ্যমান্য পিতামহ, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর, পৌত্র, পুত্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পল্লীবাসিনী, অশিক্ষিতা পিতামহীর ন্যায় তিরস্কার করিয়া থাকেন, "তোর কি এখন সময় ?" "উচ্চশিক্ষিত," গণ্যমান্য ব্যক্তি যাহা বলেন, তাহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া না দিয়া আলোচনা করা বিশেষ দরকার।

এই আলোচনার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার বিষয়ের আলোচনা না হইলেও চলিত। তৎকালে দেশের লোকের জীবনের

উদ্দেশ্য যাহা ছিল, তাহাতে সকলেই প্রায় এক পথের পথিক ছিলেন, তখন "এখন কি তোর সময় ?" এই ভর্ৎসনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু এই যুগাধিক কাল মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। দুই একটি বালক জননী-জঠর হইতেই কেমন বিগড়াইয়া আসিতেছে, তাহারা আমাদের ন্যায় গড্ডালিকা-প্রবাহে জীবন ভাসাইতে একেবারেই সম্মত হইতেছে না। পার্থিব সুখ সম্ভোগের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্ববিধ দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইবে, তবুও তাহারা বৃদ্ধের বচন মানিতে চাহিতেছে না, তবুও তাহারা ঈশ্বরের অনুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যশ, মান অনুসন্ধান করিতে স্বীকার করিতেছে না। বাল্যশিক্ষা, সংস্কার, সামাজিক প্রভাব ইত্যাদি নানা প্রকার প্রবল শক্তির কঠোর তাড়নায় এই সকল বালকের মধ্যে অনেকে সাধনভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না, তাহাদের সকল চেষ্টা ভাসিয়া যাইতেছে, তাহারা দীনাতিদীন জীবনযাপন করিতেছে। তাহাদের আদরের আদর্শ এবং বর্ত্তমান সমাজের গৌরবের আদর্শ—এই উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহারা উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িয়া হাহুতাশ করিতেছে। এই সমস্যা লইয়া অনেক গৃহে নবীনে প্রবীণে মতান্তর এবং মনো-

মালিন্য ঘটিতেছে। সুতরাং সমাজের মঙ্গলের জন্য, মানবের শান্তির জন্য এই সন্ধিক্ষণে উক্ত সমস্যার আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়। আলোচনা হইবে কি?

আর সময় নাই।

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণামানন্তর সেবকের নিবেদন—

পর পর দুইখানি বিস্তৃত পত্র পাইয়াছি। গভীর বিষাদের নিবিড় নীরদে দুইখানি পত্রই সমাচ্ছন্ন। পত্র দুইখানি যে হৃদয়ের বার্ত্তাবহ সে হৃদয়খানি যেন বিষাদে কালিমাপূর্ণ; সে হৃদয়াকাশে যেন সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারকা নাই,—আছে কেবল সূচীভেদ্য অন্ধকার,হতাশারূপ ঘনকৃষ্ণ-মেঘ; সে হৃদয়ে যেন শক্তি নাই, উৎসাহ নাই, আশা নাই,—আছে কেবল দুর্ব্বলতা, বিষাদ আর অবসাদ! আপনার মধুর হৃদয়ের এই যাতনাময় চিত্র যে এই প্রথম দেখিলাম এমন নহে; এই মর্ম্মভেদী চিত্রের সহিত আমি বহু পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছি; নূতন দেখিতেছি এইটুকু যে ছবি ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়াছে,—যাহা ইতঃপূর্ব্বে অস্পষ্ট ছিল এক্ষণে তাহা বেশ স্পষ্ট ফুটিয়াছে; ম্লান, প্রাণহীন, চিত্র ধীরে ধীরে কালক্রমে জ্বলন্ত, জীবন্ত জীবনে পরিণত হইয়াছে।

আর সময় নাই।

সকলই আমাদের কর্ম্মফল। কেন আজ হৃদয়ের এই শোচনীয় অবস্থা? কিসে সুখ গেল? কি কারণে শান্তি অন্তর্হিত হইল? আছেও ত সব,—তবে অভাব কিসের? কোন্ অভাবে এত ক্লান্তি? অর্থ? দিন ত চলিয়া যাইতেছে। মান, যশ? তাহাও ত একটু আছে। তবে হৃদয় এত ব্যথিত কেন? যাহা চাই তাহা পাই না, পাওয়ার আশাও ধীরে ধীরে নিবিয়া যাইতেছে। তাই হতাশ, তাই বিষাদ, তাই হা হুতাশ, মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, তাই কাতর ক্রন্দন!

কেন এমন হইল? যাহা চাই তাহা পাই না কেন? যাহার অভাবে আজ হৃদয় কাঁদিতেছে তাহাকে লাভ করিবার জন্য কি করিয়াছি? তল্লাভলালসাকে ত অনেক-দিনই হৃদয়মন্দিরে পূজা করিতেছি, কিন্তু সেই শুভেচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার যথেষ্ঠ চেষ্টা করিয়াছি কি? চিরদিনই ভাবিতেছি, সকল ত্যাগ না করিলে তাঁহার পূজা করা যায় না; অথচ যতটুকু অবসর পাই তাহা তাঁহার বিধানমত পূজায় নিযুক্ত না করিয়া 'আমার কিছু হইল না' —এই বিষাদ-কাহিনীর চিন্তায় নিয়োজিত করিতেছি। সকল ত্যাগের শক্তি বর্ত্তমানে নাই অথচ সকল ত্যাগের প্রতীক্ষায় সব জীবন কাটিয়া গেল। বিষাদ আসিবে

বৈ কি? অপরাধ আমাদের। অবসাদ ত আসিয়াছে, মৃত্যুও ত নিকটে। এখন করি কি? বাকি জীবনটুকুও কি অবসাদ ও বিষাদ লইয়া কাটাইব? তাহা হইলেই ত এ জীবন বৃথা কাটিল!

উপায় নাহি কি? নিশ্চয়ই আছে। অতীত অতীত, উহাকে ফিরাইবার সাধ্য কাহারও নাই,—শত আক্ষেপেও অতীতের একটি তরঙ্গও তাহার গতি ফিরাইবেনা।

"পশে যে প্রবাহ বহি অকূল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্ব্বত সদনে?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে,
উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে?"

তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য? যে অতীত কালের উপর আর এখন আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই সেই অতীতের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাকি জীবনটুকু বৃথা কাটাইব কি? ইহাতে ত লাভ নাই, সমূহ ক্ষতিই আছে। এইরূপে জীবন কাটাইলে কেবল ভারই বাড়িয়া যাইবে, বিষাদের ছায়া আরও গাঢ় হইবে। অতীত ত আক্ষেপের কারণ হইয়াছে, আর এইরূপে এক্ষণে অতীতের জন্য বৃথা অনুতাপ লইয়া বসিয়া থাকিলে বর্ত্তমানও বিষাদের কারণ হইবে।

ক্রমে অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এক নিরবচ্ছিন্ন বিষাদে পরিণত হইবে। সে কি ভীষণ জীবন! তবে করি কি?

যাও অতীত কাল, তোমার নিষ্ঠুর শ্মশানে বসিয়া আর কাঁদিব না,—তোমার জ্বালাময় চিতানল আর হৃদয়ে ধরিব না। মা, আমি অধমাধম, আমি ভজন-পূজন-বিহীন মহাপাপী, আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও। তুমি আমাকে সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত, শিশির-বিধৌত, তুষার-শুভ্র, মল্লিকার ন্যায় সুন্দর করিয়া পাঠাইয়াছিলে, তুমি আমাকে বিশ্ব-বিজয়িনী শক্তি দিয়াছিলে, তুমি আমাকে অসীম সুবিধা সুযোগ দিয়াছিলে। আমি আজ কত ধুলা-কাদা মাখিয়াছি, তোমার শক্তির অপব্যবহার করিয়াছি, তোমার প্রদত্ত সুযোগ অবহেলায় হারাইয়াছি!! ধর এই মলিন, কৃশ, ক্লান্ত, প্রাণ; তোমার "মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে" চরণপ্রান্তে রাখ—তুমি আর্ত্তের ত্রাতা, তুমি নিরাশার আশা; তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। "নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ সেও আছে তব ভবনে"; আমি মর্ম্ম-পীড়ায় পীড়িত, আমি আশ্রয়-বিহীন, আমি নিরাসা-নিপীড়িত, তোমার চরণে আমাকে আশ্রয় দাও। যখন স্বাস্থ্য ছিল, যখন শক্তি ছিল তখন তোমার দিকে চাহি নাই। আজ এই বার্দ্ধক্যে, রোগ-শোক-কাতরাবস্থায় চরণে আসিয়াছি,

চরণে স্থান দাও; আমার অতীত ক্ষমা কর; আমাকে নববলে বলীয়ান্ কর; আমার বর্ত্তমান্ ও ভবিষ্যৎ তুমি পরিচালনা কর।

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

আসুন, এইরূপে পরিতাপময় অতীতকে মায়ের চরণে বিসর্জ্জন দিয়া বর্ত্তমানে যথাশক্তি কাজ করিয়া প্রফুল্ল হই। প্রফুল্লতা যথায় নাই জীবন তথায় নাই; যাহার জীবন নাই সে মৃত; মৃত ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে পারে না। এই ভাবে এখনও আরম্ভ করিলে হয়ত কালে কিছু হইবে; আর এখনও বিষাদ লইয়া বসিয়া থাকিলে অচিরে মৃত্যু হইতে পারে।

একটা কথা আমাদিগকে বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা কেহ কেহ সময়ে সময়ে মনে করি এই বিষাদই ব্যাকুলতা। বিষাদ কিন্তু ব্যাকুলতা নহে। যেমন কোরকে কীট, মানব-হৃদয়ে তেমনই বিষাদ। ধীরে ধীরে, অলক্ষ্যে, কীট যেমন প্রসূনের জীবন হরণ করে, বিষাদ তেমনই অজ্ঞাতসারে, ধীরে ধীরে হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দেয়। অকাল মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। এতাদৃশ ভয়ঙ্কর শত্রুকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া আমাদের কদাচ কর্ত্তব্য নহে! আরও ভয়ের কথা এই যে এই ভীষণ শত্রু ছদ্মবেশী,—সে

আর সময় নাই।

ব্যাকুলতার বেশ পরিধান করিয়া আমাদিগকে ভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করে। এই শত্রুকে আমাদের ভাল করিয়া চিনিয়া রাখা দরকার। সে যেন তাহার ছদ্মবেশে আমাদিগকে প্রতারিত করিতে না পারে। ব্যাকুলতা, সাধন-ভজন-সম্ভূত; বিষাদ, ভজন-পূজন-বিহীন-অসার-কল্পনা-প্রসূত; বিষাদের জন্মদাতা কর্ম্মশূন্য ইচ্ছা; ব্যাকুলতার জনয়িতা প্রেম। বিষাদ ও ব্যাকুলতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু,—যেমন আলো ও ছায়া। ব্যাকুলতা স্বর্গের দ্বারে লইয়া যায়, বিষাদ নরকের পথ পরিষ্কার করে। এই কথাটি বুঝিয়া বিষাদকে পরিত্যাগ করতঃ ভজন-পূজন অবলম্বন করিতে হইবে।

পূজা করিব কি প্রকারে? সংসারে থাকিতে হইলে যে অর্থ চাই। অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইলে সাধারণের ন্যায় কাজ-কর্ম্ম করিতে হয়। আমরা এখন সাধারণ,—সুতরাং জোর করিয়া অসাধারণ সাজিলে ত চলিবে না। কিছুকাল সাধনা করিলে যখন শক্তি জন্মিবে তখন অসাধারণ ভাবে থাকিতে পারিব,—এক্ষণে দশ জনের ন্যায় হইয়া থাকিতে হইবে। অথচ একটু পৃথক ভাবেও থাকিতে হইবে। সংসারে থাকিয়া সাংসারিক নানা প্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সাধন ভজন করা কঠিন। কথা খুবই সত্য। কিন্তু যদি শরীর ভাল না হয়, যদি আজিও মন গঠিত না হইয়া

থাকে, কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি যদি না জন্মিয়া থাকে, প্রলোভন জয় করিতে যদি না শিখিয়া থাকি, তবে এই সংসারকেই "দুর্গ"-স্বরূপ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সংসারে থাকিয়া যতটুকু হয় তাহা করিয়াই শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে,— তাঁহার চরণে মন স্থির করিয়া শক্তি ভিক্ষা করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বর 'ভাল লোক',—ব্যগ্র হৃদয়ে আমরা যদি যথাবসর তাঁহাকে ডাকিতে থাকি তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে ডাকিবার সুযোগ করিয়া দিবেনই দিবেন। আজ আমাদের অবসর কম হইতে পারে, দু'দিন পরে নিশ্চয়ই অবসর বেশী হইবে। এক্ষণে যে সুযোগ আছে যদি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই অধিকতর সুযোগ করিয়া দিবেনই দিবেন।

কাজ কঠিন? সংসারের সমুদ্রগর্জ্জন-মাঝে বাস করিব, অথচ শান্তচিত্তে কর্ত্তব্য করিয়া প্রফুল্ল প্রাণে অবসর সময় পূজায় দিব। কঠিনই ত। খুব কঠিন। চারিদিকে প্রবল ঝড় উঠিবে অথচ আমরা অচল রহিব, কঠিন নয় ত কি? অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কাজের মত কাজ যেটা, সেটা ত কখনও সহজ হয় না। অসার আমোদ প্রমোদ যদি করিতে চাহি তবে অতি সহজেই করিতে পারি, কিন্তু যদি

আর সময় নাই।

একটু সার বস্তুর অন্বেষণ করিতে যাই অমনই কত কঠিন বোধ হয়। স্রোতে শরীর ভাসাইয়া দেওয়া অতি সহজ; স্রোত-মাঝে স্থির হওয়াই ত কঠিন! কাজের মত কাজ যাহা কিছু তাহাই কঠিন; যত কিছু অকাজ তাহাই সহজ। কাঠিন্য দেখিয়া যদি পশ্চাৎপদ হই তবে সর্ব্ব বিষয়েই পশ্চাতে থাকিতে হইবে। সুতরাং কঠিন হইলেও উহা করিতেই হইবে, কারণ "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

সমস্যা, কি ভাবে সংসারে চলিব? সংসারে যখন আপাততঃ থাকিতেই হইতেছে তখন সংসারের কাজও কবিতে হইবে। গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী অর্থ উপায় করিবার জন্য কাজ কিছু করিতে হইবে। কাজ যখন করিতেই হইতেছে তখন কার্য্যকালে "তুমি প্রসন্ন হও" বলিতে বলিতে কাজে মনোযোগ দেওয়া ভাল,—কারণ মনোযোগ-সহকারে কাজ করিলে কাজ শীঘ্র ও সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইবে। তাহাতে আমাদের সময় বাঁচিবে ও আত্মপ্রসাদ জন্মিবে; পূজার বেশ সুবিধা হইবে। আর যদি কার্য্যকালে বসিয়া বসিয়া ভাবি "হায়! অসার কাজে কাল কাটাইতেছি!" তাহা হইলে একঘণ্টার কাজে দুই ঘণ্টা লাগিবে অথচ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন

হইবে না। সময় বৃথা নষ্ট হইবে। লাভ হইবে বিরক্তি,—এত সামান্য কাজও ঠিক করিয়া করিতে পারি না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আমাদের বর্ত্তমান-কর্ত্তব্য, অতীত ও অতীতসহ-বিজড়িত বিষাদকে মায়ের চরণে সমর্পণ করিয়া, স্ফূর্ত্তি-সহকারে অপরিহার্য্য সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করতঃ, বিধান-মত সাধন ভজন করা। কিছুকাল এই ভাবে চলিতে পারিলে অবসাদ-ক্লিষ্ট ধমনীতে আবার আশার শোণিত-প্রবাহ বহিবে, আবার প্রাণ জাগিবে, অবসাদ, বিষাদ দূরে পলাইবে, আবার জগৎ সুন্দর লাগিবে, তাঁহার কৃপাও মিলিবে। আমার ত আশা এই।

জননি! যদি কোন ভুল হইয়া থাকে দেখাইয়া দিও। তোমার পরম ভক্তের মধুর হইতে মধুর হৃদয়ে ক্ষণিক শান্তি দানের চেষ্টা করিলাম। যদি অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা করিও, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিও। নীরব থাকিলে কি, মা, ভাল হইত? পীড়িত হৃদয়কে বিষাদের কথা শুনাইয়া অধিকতর পীড়িত করিলে কি, মা, ভাল হইত? কি জানি! ভাল মন্দ না বুঝিয়া করিয়া ফেলিলাম এক কাজ। মা, ক্ষমা করিও। ইতি—

প্রণত সেবক

****

কেন হইতেছে না ?

লোভে লোভে, আশায় আশায় বহুদিন অতিবাহিত হইল তবুও ত লালসার ধন মিলিল না, তবুও ত আশা পূর্ণ হইল না ! বিশ্বজননীর চরণ-কোকনদে মধুলেহীসম মকরন্দ-পানে নিলীন হইব সাধ করিয়াছিলাম। দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে কত কাল চলিয়া গেল, —আজিও ত শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে চিরস্থির হইতে পারিলাম না ! কায়মনোবাক্যে আমি তাঁহারই হইতে অভিলাষ করিলাম, কিন্তু আমার দেহ, চিত্ত, বাণী ত তাঁহার হইল না। মায়ের পতিতপাবন নাম মধুময় তানে গাহিব বলিয়া আমার এই সাধের বীণা বাঁধিবার বাঞ্ছা করিয়াছিলাম, কতবর্ষ জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া গেল আজিও ত বীণা বড়ই বেসুরা বাজিতেছে !

কেন এমন হইল ? কেন হইতেছে না ? শ্রীশ্রীমা ত করুণাময়ী, সন্তানবৎসলা জননী, তবে তাঁহার সন্তানের আশা অপূর্ণ রহিতেছে কেন ? এই কায়া তাঁহারই রচনা, এই মন তাঁহারই লীলা-প্রসূত, এই বাকৃশক্তি তাঁহারই

অসীম শক্তির সামান্য অভিব্যক্তি মাত্র, তবে যাহা তাঁহার নিজস্ব তাহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিতেছি না কেন? মায়ের বস্তু মাকে ফিরাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না কেন? পরদ্রব্যে এই দারুণ আসক্তি কেন?

সত্যশূন্যাড়ম্বরপরিপূর্ণ নগর হইতে বহু দূরে, দেবভূমি পর্ব্বত-রাজ হিমাচলের অনতিদূরে, শ্যামশষ্পপরিশোভিত প্রান্তরপার্শ্বে, সত্যপ্রচারক শ্মশান সমীপে উপবেশন করিয়া দ্বিপ্রহরের নীরবতার মাঝে ব্যর্থ প্রয়াসের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতেছি। নিদাঘের মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের খরকর পীড়িত হইয়াই হউক বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক একটি বিহঙ্গম অবিরলধারে, কুক্, কুক্, কুক্, শব্দ করিতেছে। প্রতি কুক্-ধ্বনি আমার স্থির মনের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া আমার প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় বাহির করিয়া আমার নয়নসমীপে ধরিতেছে। মলিন চরিত্রের কি মর্ম্মন্তুদ চিত্রই দেখিতেছি। বিহঙ্গম, তোমার প্রসাদে আজি আত্মচরিত্রের যে স্বরূপ দেখিতেছি তাহা অক্ষর-সাহায্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিব। পুনরায় যখন লোকালয়ে প্রবেশ করিব, পুনরায় যখন স্থানমাহাত্ম্যে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে অতুলনীয় মনে করিব তখন এই চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিলেও হয় ত ক্ষণেকের জন্যও অহঙ্কার শান্তভাব ধারণ করিবে। বিহঙ্গম, আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ কর। বন্ধু, তোমার এই উপকার যাবৎ এ দেহে প্রাণ রহিবে তাবৎ বিস্মৃত হইব না।

চিত্তফলকে বিশ্বজননীর চরণ-ছায়া মুদ্রিত করিতে হইলে ফলক নির্ম্মল, শুভ্র হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। আমি ত মনে করিয়া আসিতেছিলাম যে আমার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে। কিন্তু আজি চরিত্রের যে চিত্র দেখিতেছি তাহাতে বিশেষ ভাবনা হইতেছে। দেখিতেছি, বিষয়ানুরাগ চিত্তকে ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। এই বিষয়ানুরাগ যে সদা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারি না তাহার কারণ সে এক জটিল ছদ্মবেশ পরিধানপূর্ব্বক সুন্দররূপে স্বরূপ গোপন করিয়া চলিতেছে। আজি এই শান্তক্ষণে যশোরূপবিষয়ে বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে। লোকহিতৈষণার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া যশোলাভলিপ্সা আমাকে বিড়ম্বিত করিতেছে। এই যশোলিপ্সা যে প্রকারে আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা অতীব বিস্ময়কর। সৎগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে ভগবদ্ভক্তি উপ-জিত হইবে, তাঁহার রাতুল চরণে মন মজিবে—এই আশায় সৎগ্রন্থ পাঠ করি। কোন কোন দিন এমন ঘটে যে অধ্য-য়নকালে সৎগ্রন্থ-বর্ণিত ভগবদ্বিষয় অনুধ্যান করিতে করিতে

চিত্ত ধীরে ধীরে তাঁহার চরণারবিন্দে সুস্থির হইয়া যায়; তখন কোন প্রকার জ্বালা থাকে না, যাতনা থাকে না, দেহে এক অভিনব শক্তিসঞ্চার হয়, ধরণী এক রমণীয় ছবি ধারণ করে! কোন কোন দিন আবার সৎগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে করিতে পাঠ পরিত্যাগ করিয়া আবেগভরে স্বয়ং সৎকথা লিখিতে বসি। অনুসন্ধান করিয়া করিয়া সুন্দর সুন্দর শব্দ সংগ্রহ করি। শব্দে শব্দে বিনাইয়া বিনাইয়া ভাব প্রকাশ করি। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীশ্রীচরণ পরিত্যাগ করিয়া মন এই শব্দসাগরে প্রবেশ করিতেছে কেন জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর করে যে সৎকথা প্রচার করিয়া, জনসাধারণকে সাধনপথের সংবাদ প্রদান করিয়া, সে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে, ইহাও সাধনার অঙ্গবিশেষ। মোহের প্রিয় বিলাসভূমি হইতে দূরে, স্নেহময়ী প্রকৃতি-জননীর স্নেহক্রোড়ে উপবেশন করিয়া স্বরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে বিহগস্বরে এই সময়ে প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। এই শুভমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি যে রচনায় যে অভিনিবেশ তাহা নিঃস্বার্থপরোপকারেচ্ছাসম্ভূত নহে, তাহা যশোলাভ-লিপ্সাসঞ্জাত। সৎগ্রন্থের ভাষার সৌন্দর্য্যে, সঙ্গীতের মূর্চ্ছ‍্নায় যে দিন সুপ্ত বাসনা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে সেই দিন শব্দে শব্দে সৌন্দর্য্য রচনা করিবার জন্য, তালমানলয়ে সঙ্গীতলহরী

তুলিবার জন্য, লোকচিত্ত বিনোদিত করিয়া যশোলাভ করিবার জন্য মুগ্ধ প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সংযমের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া উন্মত্ত প্রাণ কাগজ কলম গ্রহণ করে! এই শুভ-মুহূর্ত্তে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কে বলিতেছে "ভ্রান্ত হইও না। যশের কুহকে ভুলিও না। কাগজ কলম পরিত্যাগ কর। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীশ্রীচরণ বক্ষে ধারণ কর। তুমি শ্রীশ্রীমাতার দর্শন লাভ করিতে পার নাই, তদেকচিত্ত হইয়া এক্ষণে অভীষ্টলাভে যত্নবান্ হও। যে ব্যক্তি বিশ্ব-জননীর চরণতলে উপবেশন করিয়া সত্য শিক্ষা করিতে পারে নাই সে যাহা ভাবিবে, সে যাহা বলিবে, সে যাহা লিখিবে তাহা যে সত্য তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? তাহার তথাকথিত জ্ঞান যে অজ্ঞানান্ধকার ঘনীভূত করিবে না তাহার স্থিরতা কোথায়? বিষয়ানুরাগবিমূঢ় জন নানা ভাবে বিষয়ের সেবা করিয়া নিত্যই ইহলোকে প্রতারিত হইতেছে, তুমি সাবধান হও, নতুবা যাহা চাহিতেছ তাহা পাইবে না"।

কেবল বিষয়ানুরাগই যে চিত্তফলক মলিন করিয়া রাখি-য়াছে এরূপ নহে। নিদাঘ দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতায় নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছি যে, আত্মাদর চিত্তের অন্যতম কলঙ্ক রচনা করিতেছে। যশোলাভ-লিপ্সার ন্যায় আত্মাদরও

ছদ্মবেশে স্বরূপ লুক্কায়িত রাখিয়াছে। আজি এই শুভদিনে আত্মাদরের ছদ্মবেশ অপসারিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ প্রকটিত হইতেছে। সৎসঙ্গ ভগবদ্ভক্তিলাভের অন্যতম উপায় বলিয়া, ভক্তজনের ভক্তিরাগরঞ্জিত, শান্ত, মধুর চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া, ভক্তের আত্মহারা, উন্মত্তভাব অবলোকন করিয়া, তাঁহার পূতমুখে পবিত্র ভগবদ্ কথা শ্রবণ করিয়া মলিন জীবন নির্ম্মল করিবার লালসায় দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিলাম, গহন কাননে প্রবেশ করিলাম, বিজন শ্মশানভূমিতে বিচরণ করিলাম, দুরারোহ গিরিশিখরে আরোহণ করিলাম, বহু সাধু সন্ন্যাসী তপস্বীর চরণপ্রান্তে উপবেশন করিলাম, কিন্তু যে রমণীয় ছবি দর্শন করিবার জন্য এতাদৃশ প্রয়াস করিলাম সে দৃশ্য ভাগ্যে ত ঘটিল না। প্রকৃত ভক্ত ভগবানের সমীপবাসী ; তাঁহার দর্শনলাভ ভগবদ্দর্শনলাভের পূর্ব্বাভাস, বিশেষ পুণ্য না থাকিলে ভক্তদর্শনরূপ বিশেষ সৌভাগ্য ঘটিবে না ;—এই সত্য মনে করিয়া ভক্তদর্শনাশায় বঞ্চিত হওয়ায় তাদৃশ দুঃখিত নহি। তবে মনে এক দুঃখ বড়ই বাজিতেছে। যাঁহাদের চরণ দর্শন ভাগ্যে ঘটিল তাঁহাদের সকলেরই প্রতি অনাদর জন্মিল। সত্য বটে তাঁহারা কেহই আমার উচ্চ আদর্শের সমুজ্জ্বল ভূমিতে

উপস্থিত হইতে পারেন নাই; সত্য বটে তাঁহাদের সকলকেই কোন না কোন প্রকার বিষয়ে অনুরক্ত দেখিলাম; কিন্তু তাহা বলিয়া আমার এই দুর্দ্দশা কেন হইল, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদের প্রতি আমার এই রাগাভাব কেন? সাধুগণের ভণ্ডামিই আমার এই অশ্রদ্ধার হেতু,—ইহা বলিয়া প্রতারক মন আমাকে এতদিন ভুলাইয়া আসিতেছে। আজ যখন মোহের রাজ্য হইতে ক্ষণেকের জন্যও বাহিরে আসিয়াছি তখন বুঝিতেছি যে, এই সজ্জনানাদর আমার হীন আত্মাদর হইতেই সম্ভূত, আমি আমাকে এতই ভালবাসি যে অন্য কাহাকেও ভালবাসিবার ক্ষমতা আমার নাই, আমার গুণরাশিতে আমার হৃদয় এতই পূর্ণ যে সে হৃদয়ে অন্যজনের গুণের একান্ত স্থানাভাব। এক্ষণে দেখিতেছি আমার অহঙ্কারই আমার শত্রু হইয়াছে।

ঈশ্বরনির্ভরতা ঈশ্বরলাভের অপরিহার্য্য অবলম্বন। শরণাপন্নকে আশ্রিতবৎসলা জগজ্জননী কখনও পরিত্যাগ করেন না। যে সাধক সত্যসত্যই তাঁহাতে নির্ভর করে—তিনি সত্যই তাহার সকল ভার গ্রহণ করেন, তাহাকে সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করেন, তাহা দ্বারা সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় সাধন ভজন সম্পাদন করাইয়া

শরণাগতকে চরণপ্রান্তে আনয়ন করেন। সাধু তারস্বরে এই সত্য ঘোষণা করিতেছেন; শাস্ত্র মেঘমন্দ্রে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। নির্ভরশীলের প্রতি ঈশ্বর-করুণার উপাখ্যান শ্রবণ করিতে করিতে প্রাণ বিগলিত হইতেছে। কত লোকের নিকট অভূতপূর্ব্ব ঈশ্বর-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি। আপনাকে জনৈক ঈশ্বর-নির্ভরশীল ব্যক্তি মনে করিয়া কতই আনন্দ লাভ করিতেছি। কিন্তু নির্ভর কি করিতে পারিয়াছি? সেদিন অশীতি-পর-বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিলেন—"বাবু, সংসারের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন, ঈশ্বরের দ্বারে উপস্থিত হউন নতুবা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না।" "শরীর নিতান্ত অপটু, নিত্যই ব্যাধি লাগিয়া রহিয়াছে, সতত কবিরাজের সাহায্য আবশ্যক,"—আপত্তি করিলাম। হাসিয়া কহিলেন "যদি ঈশ্বরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেও রোগ হয় এবং কবিরাজের আবশ্যক হয় তাহা হইলে হিমালয়ের গুহার নিভৃতপ্রদেশে কবিরাজ অনাহূত হইয়াই উপস্থিত হইবেন।" বলিলাম, "শীতকালে শীতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, হিমালয়ের দারুণ শীতে শীতনিবারণ হইবে কি প্রকারে?" মধুর অধরে মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বাবু, পরের দাসত্ব করিয়া দিন রাত্রি পরিশ্রম করেন তাহাতে ত দেহে

সামান্য বস্ত্রই উঠিয়াছে, দেখিতেছি। ঈশ্বরকে গ্রহণ করুন, যদি শীতে কষ্ট হয় তাহা হইলে অনায়াসে জামিয়ার মিলিবে। ঈশ্বরকে একবার পরীক্ষাই করিয়া দেখুন না!” শরণাগতকে ঈশ্বর যে সতত রক্ষা করেন স্বীয় জীবনে তাহার কত পরিচয় পাইয়াছেন, সহাস্যে সাধু তাহা শুনাইলেন, শুনাইয়া বলিলেন, “আপনার মঙ্গল হইবে বলিয়া সকল কথা বলিলাম। এক্ষণে গৃহে গমন করুন। প্রভাতেই যাত্রা করিবেন।” বলিলাম, “প্রভো, আমার বহু ঋণ, ঋণ পরিশোধ না করিয়া কেমন করিয়া যাইব।” উত্তরে হাসিয়া “কালু সাহার” গল্প বলিলেন এবং আদেশ করিলেন, “উত্তমর্ণগণকে লিখিয়া দিউন যে আপনি ঈশ্বরের দাসত্ব গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা আপনার নূতন প্রভুর নিকট হইতে তাঁহাদের অর্থ স্বদে আসলে পাইবেন।” সন্ধ্যার ছায়া পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে, শান্তস্বরে পুনরায় কহিলেন, “ঐ দেখুন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। দিবাবসান অবলোকন করিয়া পক্ষিগণ স্ব স্ব কুলায়ে গমন করিতেছে। যাউন, গৃহে যাইয়া আপনার বিশ্বজননীর ধ্যানে নিযুক্ত হউন।” চরণে প্রণাম করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তাহার পর কতদিন অতিবাহিত হইয়াছে, ঈশ্বরের দ্বারে দাঁড়াইতে পারিয়াছি কি? “ঈশ্বর হস্ত পদ দিয়াছেন,

চক্ষু কর্ণ দিয়াছেন, জ্ঞান বুদ্ধি দিয়াছেন, আহার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যদি স্ব স্ব গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ না করি তাহা হইলে তিনি আমাদের অশনবসনের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার চিরপ্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিবেন কেন?”—এই বিচারবলে মন আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছে। কিন্তু আজি যখন বিচারের রাজ্য উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্বাসের ভূমিতে মুহূর্ত্তের জন্যও উপস্থিত হইয়াছি তখন কুহকী মনের কুহক ছুটিয়া গিয়াছে, তখন শুনিতে পাইতেছি “যে আইন করিয়াছে সে আইন রদ্ করিতে পারে”। এখন বুঝিতেছি আমার ক্ষুদ্র শক্তির উপর আমার নির্ভর আছে, কিন্তু যাঁহার শক্তিতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সঙ্ঘটিত হইতেছে সেই সর্ব্বশক্তিময়ীর অনন্ত শক্তিতে আমার নির্ভর নাই!

এই পুণ্যমুহূর্ত্তে বুঝিতেছি, কেন হইতেছে না। বিষয়ানুরাগ, অহঙ্কার, অবিশ্বাস হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, সুতরাং সেই অন্যাধিকৃত প্রদেশে প্রেম প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। প্রকৃত পক্ষে আমি বিষয়ের সেবা করিতেছি, শুধু মুখেই বলিতেছি যে আমি সাধনা করিতেছি। এতাদৃশ আত্মপ্রতারণায় কি জননীর চরণতলে উপস্থিত হওয়া যায়! কায়মনোবাক্যে জগজ্জননীর

কেন হইতেছে না।

সেবায় নিযুক্ত না হইলে কি সেই দুর্ল্লভ বস্তু লাভ করা যায়? বিশ্বাস করিব না, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিব না, বিষয় সেবা করিব অথচ শ্রীশ্রীমায়ের চরণকমলে চিরস্থির হইব, ইহা কি কখনও সম্ভব? বিনয়, বিশ্বাস ও বৈরাগ্য এই তিনটি ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তি রচনা না করিলে শুধু মুখের বচনে কি ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায়! সাধক সত্যই গাহিয়াছেন—

"তোমাতে আমাতে শুধু মুখের কথাতে
হরি, হবে কি গো পরিচয়?
আমি ডাক্‌তে হয় ডাকি, আবার বিষয় নিয়ে থাকি,
ফাঁকি দিলে কি জানা যায়?

—০—

অন্তরায়,—স্বকর্ম্ম।

তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে চাহি। ডাকিতে ত পাই না। ডাকিতে পাই না, না,—পারি না,—ডাকি না? বেশ শান্তভাবে প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ব্যাধি নির্ণয় করিতে হইবে। ব্যাধি ঠিক ঠিক ধরিতে পারিলে ঠিক ঠিক ঔষধের ব্যবস্থা হইতে পারে।

সত্যই কি ডাকিবার ইচ্ছা থাকিতেও ডাকিতে পাই না? হাঁ, সত্য বৈ কি। বহু পূর্ব্বের কথা ঠিক মনে পড়ে না। যতদিনের কথা মনে পড়ে ততদিনের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, প্রায় এক যুগ ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিবার ইচ্ছা সদাই মনের মাঝে জাগিতেছে। দ্বাদশ বর্ষ এই ডাকিবার ইচ্ছা জাগিতেছে সত্য, কিন্তু এই দ্বাদশবর্ষের মধ্যে কতদিন তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার সুযোগ পাইয়াছি? তাহা হইলে, ডাকিবার ইচ্ছা থাকিতেও ডাকিতে পাই না,—ইহা বলিব বৈ কি।

ডাকিবার ইচ্ছা থাকিতেও ডাকিবার সুযোগ পাই না, ইহা না হয় সত্য হইল, কিন্তু ডাকিবার ইচ্ছা থাকিতেও

ডাকিতে পারি না, ইহাও কি সত্য? সত্য বৈ কি। এই দ্বাদশবর্ষের মধ্যে যে সময়ই সুযোগ পাইয়াছি, সেই সময়ই কি ডাকিতে পারিয়াছি? ডাকিবার ইচ্ছা আছে, সুযোগ পাইয়াছি, নির্জ্জনে আসন পাতিয়া বসিয়াছি, কিন্তু ডাকিতে পারি নাই,— এমন ত বহুদিনই ঘটিয়াছে। তাহা হইলে এ কথা সত্য যে ডাকিবার ইচ্ছা থাকিতে, সুযোগ পাইলে, ডাকিতে পারি না।

আচ্ছা, ডাকিবার ইচ্ছা আছে, সুযোগ জুটিয়াছে অথচ ডাকি না,—ইহাও কি সত্য? সত্য বৈ কি। ডাকিবার ইচ্ছা আছে, ডাকিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, না ডাকিয়া প্রাণ কাঁদিতেছে তবুও ডাকিতেছি না,—এমন ত অনেক দিন ঘটিয়াছে। প্রাণ যাহা সত্যসত্যই চাহে না, যাহার অনুসরণে মন সত্য সত্যই যাতনা পায়, অবসর পাইয়া তাহারই অনুগমন ত শতদিন করিয়াছি। অতএব ইহা ধ্রুবসত্য যে ডাকিবার ইচ্ছাসত্ত্বে, ডাকিবার সুযোগ পাইলেও তাঁহাকে ডাকি না।

সুতরাং ডাকিতে পাই না, ডাকিতে পারি না, ডাকি না—ব্যাধি এই তিনটি।

রোগ ত ধরা পড়িল। এখন এই রোগের কারণই বা কি, আর ইহার ঔষধই বা কি?

রোগ তিনটি বটে, কিন্তু রোগের কারণ মাত্র একটি; —সে স্বকর্ম্ম। এই যে ইচ্ছা থাকিতেও ডাকিবার সুযোগ ঘটে না ইহার কারণ আমার কর্ম্ম। এই যে ইচ্ছা আছে, সুযোগ মিলিয়াছে তবুও ডাকিতে পারি না ইহার কারণ আমার কর্ম্ম। এই যে ইচ্ছা থাকিলেও, সুযোগ মিলিলেও ডাকি না ইহারও কারণ আমার কর্ম্ম। আমার মন্দ কর্ম্মের ফলে আমি এই যাতনা পাইতেছি। ইচ্ছা আছে শক্তি নাই, শক্তি আছে ক্রিয়া নাই, ক্রিয়া নাই অনুতাপ আছে,—এ বড় কঠিন সাজা। সাজা যখন এত বড়, পাপও তখন ঠিক তত বড়। ঈশ্বর আমার শত্রু নহেন, আমার প্রতি তাঁহার কোন হিংসা দ্বেষ নাই, সুতরাং আমাকে কষ্ট দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা নহে; তবুও যে কষ্ট দিভে হইতেছে ইহার কারণ আমার স্বীয় অপরাধ। যখন স্কন্ধে ভূত চাপে তখন মনে হয় ঈশ্বর অন্যায় করিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছেন, আমি তাঁহার জন্য এত করি, তিনি কেবল দূরে সরিয়া যান। কিন্তু এই এখনকার ন্যায় ভূত যখন স্কন্ধ হইতে নামে, তখন দেখি, "স্বখাত সলিলে ডুবে মরি, মা শ্যামা!" মানুষ স্বকর্ম্মফল ভোগ করে, আমিও আমার কর্ম্মফলে বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছি। আমার ব্যাধির মূল আমার আপনার কর্ম্মরাশি।

অন্তরায়—স্বকর্ম্ম।

আচ্ছা, আমার কোন্ কর্ম্মফলে আমি ডাকিবার সুযোগ পাই না? কেন সুযোগ পাই না তাহার কারণ বাহির করিতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে না। আমার অবস্থা একটু আলোচনা করিলেই তাহা ধরা পড়িবে। আজ ডাকিবার সাধ জাগিয়াছে, সত্য; কিন্তু চিরদিনই কি এই সাধ ছিল? না, ছিল না। তখন অন্য কামনা ছিল,—অন্য বস্তু লাভ করিবার জন্য স্বয়ং কত যত্ন করিয়াছিলাম, ঈশ্বরের নিকটই বা কত প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এখন সেই যত্নের ও কামনার ফল ভোগ করিতেছি। স্ত্রীপুত্রের জন্য সাধ করিয়াছিলাম। স্ত্রীপুত্র মিলিয়াছে। আজ তাহাদের লালনপালনের জন্য দিনরাত্রি পরের দ্বারে অর্থান্বেষণে ফিরিতে হইতেছে,—ঈশ্বরকে ডাকিবার সময় মিলিতেছে না। নাম যশের জন্য পাগলের ন্যায় কতই ছুটাছুটি করিয়াছি, পরের মনোরঞ্জনের জন্য কতই তোষামোদ করিয়াছি। আজ একটু নিভৃতে বসিয়া আত্মচিন্তা করিতে চাহিতেছি, কিন্তু তাহা হইবে কেন?—যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া মান যশ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, আজ তাহারা আমাকে নিভৃতে স্থির হইতে দিবে কেন? দুরন্ত বাসনা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া জগতে যাহা কিছু চক্ষে সুন্দর লাগিয়াছিল, তাহাই আমার করিবার জন্য কতই কামনা করিয়া

ছিলাম—কত যত্ন করিয়া এই জঁাকাল সংসার রচনা করিয়াছি। যাহাদিগকে সহায় করিয়া এতদিন সুখের বস্তুনিচয় সংগ্রহ করিয়াছি, যাহাদিগকে লইয়া এতদিন আমোদ আহ্লাদ করিয়াছি, আজ তাহাদিগকে আমি ত্যাগ করিতে চাহিলেও তাহারা আমাকে সহজে ছাড়িবে কেন? "পলাইতে চাও? কোথা পলাইবে? কর্ম্ম-ফঁাস বাঁধা গলে, তুমি ক্রীতদাস তার।" এই দেহেরই বা কত আদর করিয়াছি। আজ বৈরাগ্য আসিতেছে সত্য, কিন্তু এতদিনের আদরের দেহ অকস্মাৎ অনাদরে রাজী হইবে কেন? এইরূপ নানা কারণে ডাকিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও ডাকিবার সুযোগ মিলে না।

ইহার কি কোন প্রতীকার আছে? সুযোগ-সংযোগের কোন উপায় আছে কি? আছে বৈ কি। যে যে কারণে আজ অবসর মিলিতেছে না, সেই সেই কারণ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া চাই। তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি কি? শিশু যেমন তাহার মায়ের মুখখানি দেখিবার জন্য ব্যগ্র হয়, আমি আমার বিশ্বজননীর জন্য তেমন ব্যাকুল হইয়াছি কি? মনে করিতেছি,—সন্ধ্যা করি, আহ্নিক করি, সুতরাং ঈশ্বরকে চাই বৈ কি? সুতরাং সকল অন্তরায় ত্যাগ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি বৈ কি। মনে ত করিতেছি যে,

আমি ভক্ত হইয়াছি কিন্তু সত্য সত্যই কি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি? শিশুর প্রাণ যখন মায়ের জন্য কাঁদে, তখন তাহাকে ভুলাইবার জন্য রঙ্গীন চুষিকাটি বা সুমধুর ঝুন্‌ঝুনি দিলেও সে শান্ত হয় না। সে সকল প্রকার সুন্দর মধুর খেলনা দূরে ফেলিয়া দিয়া তাহার মায়ের জন্যই কাঁদিতে থাকে। আমার জননীকে দেখিবার জন্য আমি কি জগতের কোন সুন্দর মধুর দ্রব্য ত্যাগ করিয়াছি? তাহা ত করি নাই। তবে ত আমার ব্যগ্রতা নাই, শুধু আত্মপ্রতারণা করিতেছি। তাই আজ অবসর মিলিতেছে না। ঠিক ঠিক আগ্রহ হইলে সুযোগ জুটিতই। কি বলিতেছ, মন? গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যতীত অন্য কারণে ইতস্ততঃ ধাবিত হই না। ভাল; একটু আলোচনা করিলেই সত্য ফুটিয়া উঠিবে। স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের জন্য অর্থের প্রয়োজনে ঘুরিয়া বেড়াই। সে ত ভাল; আমার স্ত্রীপুত্রকে আমি খাওয়াইব পরাইব না ত কি পাড়ার লোকে খাওয়াইবে পরাইবে? কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ মিলিয়া গেলেও ত ঘুরি-তেছি। আরও চাই, আরও চাই,—এই ভাব ত মনের মধ্যে বেশ আত্মগোপন করিয়া বসিয়া আছে। প্রয়োজনীয় অর্থ মিলিয়া গিয়াছে তবুও ত পরের দ্বারে গোলামি করিতে ফিরিতেছি, তবুও ত যাহাকে প্রসন্ন রাখিলে আরও অর্থ

মিলিতে পারে তাহাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য আজিও তাহার দ্বারে ধর্‌না দিতেছি। যদি সত্য সত্যই ঈশ্বরকে ভালবাসিতাম, যদি সত্য সত্যই ভজনা করিবার জন্য প্রাণ কাঁদিত, তাহা হইলে কি আর এমন করিতাম। তবেই দেখা গেল যে প্রয়োজনীয় অর্থ মিলিয়া গেলে অধিকতর অর্থের জন্য ধাবমান না হইলে ডাকিবার অবসর একটু মিলিতে পারে। আরও একটু নিগূঢ় কথা আছে। যদি তাঁহাকে ডাকিবার অবসর লাভ করিবার লোভে অর্থো-পার্জ্জনের একটু ক্ষতি স্বীকার না করি, অর্থাভাবজনিত কষ্ট বেশ একটু সহিতে বদ্ধপরিকর না হই, তাহা হইলে ত তাঁহার জন্য মনের টান খুবই অধিক! এতাদৃশ ক্ষীণপ্রাণ প্রেম যার তার অবসর মিলে না।

তাহার পর নাম যশের কথা। নাম যশ অর্জ্জন করিবার জন্য যে কত করিয়াছি, কত সত্যকে অসত্যে পরিণত করিয়াছি, কত যাহা নহি তাহা সাজিয়াছি, কত যাদুমন্ত্র ছড়াইয়াছি তাহা ত আমার অবিদিত নহে। অর্জ্জিত যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এখনও আকণ্ঠ পিপাসা, তাই এখনও পূর্ব্বের বন্ধুগণকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তাই সুযোগ পাইলেই তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য যথেষ্ট প্রয়াস করিতেছি, তাই তাহারা পথে ঘাটে আমাকে ঘিরিয়া

ধরিতেছে, তাই আমার ভাগ্যে নির্জ্জনতা মিলিতেছে না। যদি ডাকিবার অবসর চাই তাহা হইলে এই যশের রক্ষণে বেশ একটু উদাসীন হইতে হইবে, এই বিষয়ে উদাসীন হইলে আমার অতীতের সহচরগণ আমাকে ক্রমশঃ ছাড়িতে আরম্ভ করিবে, আমারও নির্জ্জনতা জুটিবে।

তাহার পর ভোগসুখের কথা, আমোদ আহ্লাদের কথা। পূর্ব্বে যাহাদিগকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়াছি এখন তাহাদিগকে অন্তরের অন্তর করিতে অন্তর ছিঁড়িয়া যায়,—তাহারা বেদনা পায়, আমি বেদনা পাই। তাই তাহাদিগকে লইয়া আজিও আমোদ, আহ্লাদ, রঙ্গরস করি। মন, তোমার এখনও এত দুর্ব্বলতা, আর তুমি তাঁহাকে ডাকিবার অবসর পাও না বলিয়া দুঃখ কর। তোমার আত্মপ্রতারণা দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। তুমি কি ভুলিয়া গেলে—

"প্রেমের এই মানা, না হলে প্রেম ত রবে না,
পিয়া বিনে অন্য পানে চাইতে পাবে না।"

যদি সত্যসত্যই ডাকিতে চাহি তাহা হইলে যতই প্রাণে বেদনা লাগুক না কেন, পার্থিব প্রণয়িগণকে ত্যাগ করিতেই হইবে। রঙ্গরসের সহচরগণকে একটু অন্তরে রাখিলে ডাকিবার সুযোগ মিলিতে পারে।

তাহার পর দেহের কথা। পুরাতন অভ্যাস দেহ সহজে ত্যাগ করিতে পারে না, সত্য। কিন্তু ধীরে ধীরে, একটু একটু করিয়া নূতন অভ্যাস আরম্ভ করিলে, পুরাতন অভ্যাসের দাসত্বের জ্বালা হ্রাস হইতে পারে। অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমে চাই মনে বল। মনের জোর করা চাই, আমি ইহা ত্যাগ করিব। একদিনে না হইতে পারে, দুই দিনে না হইতে পারে, তিন দিনে হইবেই হইবে। তবে পুরাতন অভ্যাস ত্যাগ করা বড় কঠিন বলিয়া পুরাতন অভ্যাসকেই দোষী স্থির করতঃ আপনাকে পরম ভালমানুষ মনে করিয়া নিশ্চিন্তে চিরাভ্যস্ত পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলে, দেহের সেবাতেই চিরজীবন রত থাকিতেই হইবে, ডাকিবার অবসর আর মিলিবে না।

কোন্ পথ অবলম্বন করিলে ডাকিবার সুযোগ পাইব তাহা বুঝিলাম। এক্ষণে কথা হইতেছে, ডাকিবার সুযোগ পাইলেও যে ডাকিতে পারি না, ইহার উপায় কি, ডাকিবার ইচ্ছাসত্ত্বে, ডাকিবার সুযোগ মিলিলেও যে ডাকিতে পারি না এই বিড়ম্বনা আমার কোন্ কর্ম্মের ফল? আর এই বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার উপায়ই বা কি? ডাকিতে পারি না। কেন পারি না? স্থান ত বেশ নির্জ্জন, আসন ত বেশ সুখদায়ক; তবুও ডাকিতে পারি-

তেছি না। কেন? ডাকিতে বসিলে কত কি ভাবনা আইসে। যখন কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকি তখন সেই কার্য্যে ডুবিয়া থাকি, অন্য ভাবনা মনে স্থান পায় না, কিন্তু যেই সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে আসিয়া আহ্নিক করিতে বসি মন অমনই বাঁদরের ন্যায় লাফালাফি জুড়িয়া দেয়,—এক ভাবনা হইতে নিমিষে ভাবনান্তরে ছুটিয়া যায়, ভয় হয় যুগপৎ বিবিধ ভাবনার প্রবল মন্থনে মাথাটা বুঝি ঘুরিয়া যাইবে, বুঝি বা পাগল হওয়ার উপক্রম হয়। আমি ত ডাকিতে চাই, তবে এমন আপদ ঘটে কেন? অন্য সময় হইলে বলিতাম "ঈশ্বরের দোষ, তিনি কাহাকেও তাঁহার নিকট যাইতে দিতে ইচ্ছুক নহেন। তাই কেহ তাঁহাকে ডাকিতে বসিলে তিনি বহু বিঘ্ন প্রেরণ করিয়া তাহার তপস্যা নষ্ট করিয়া দেন।" আজ এখন আর সেই উত্তর আসিতেছে না। এখন দেখিতেছি, দোষ আমার নিজের। এই যে মন, শাখায় শাখায় শাখামৃগের ন্যায় লাফালাফি করে, ইহার কারণ আমার কর্ম্ম। সমগ্র জীবন যাহাকে নিত্য সর্ব্বক্ষণ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নাচাইয়া আসিলাম, এক্ষণে তাহাকে বাঁধিতে গেলে সে যদি বাঁধা পড়িতে না চায় তাহা হইলে সে দোষ বিধিরও নহে, মনেরও নহে, সে দোষ যে

এতদিন বাঁদর নাচাইয়া আসিয়াছে তাহারই, সে দোষ আমারই।

দোষ ত আমার বুঝিলাম, এখন উপায়? এই উচ্ছৃঙ্খল মনকে কি প্রকারে শৃঙ্খলিত করিব? ব্যাপার নিতান্তই কঠিন। মনের দশা একবার এইরূপ হইলে তাহাকে স্থির করা একান্তই দুরূহ। তবু স্থির করিতে হইবে, নতুবা অহরহঃ জ্বালায় জ্বলিতে হইবে। কি উপায়ে শান্ত হইতে পারিব? বিচারবলে মনকে ধীরে ধীরে স্থির করিতে হইবে। যে সকল ভাবনা আসিয়া মনকে নাচায় সেই ভাবনাগুলিকে ধরিতে হইবে, একে একে তাহাদের বিশ্লেষণ করিতে হইবে, প্রত্যেক ভাবনার বস্তুর সহিত ঈশ্বরের মহিমার তুলনা করিতে হইবে, তাঁহার মহিমার সহিত তুলনায় সেই বস্তুর অসারতা ধরিতে হইবে, সেই অসারতা শুধু বুদ্ধি দ্বারা বুঝিলে হইবে না, এই বোধকে প্রাণে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে চাঞ্চল্যোৎপাদক বস্তুনিচয় প্রাণের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দিয়া সেই মুক্তপ্রাণ ভগবৎপ্রেমে পরিপূর্ণ করিতে হইবে। কেবল আহ্নিকের সময় ইহা করিলেই যে হইবে তাহা নহে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে—"শয়নে স্বপনে সদা জাগরণে"—এই ভাব জ্বলন্তরূপে প্রাণে অনুভব করিতে

হইবে, এবং জীবনের সকল কর্ম্মই এই ভাব বজায় রাখিয়া করিতে হইবে। যদি একবারও এই ভাবের প্রতিকূলে পদক্ষেপ করা হয় তাহা হইলে ভাবের ঘরে চুরি হইবে, ভাব চলিয়া যাইবে, ভাব চলিয়া গেলে মন পুনরায় তাহার মর্কট-প্রকৃতি ধারণ করিবে, সে আবার ডালে ডালে নাচিতে আরম্ভ করিবে।

তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু আমার যে আর এক উপদ্রব আছে। সেই বিঘ্ন আসিয়া আমাকে স্থিরচিত্তে কিছুই ভাবিতে দেয় না। একান্তে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্থিরভাবে কোন এক বিষয় ভাবিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিলেই আমার তন্দ্রা আইসে। আমার ইহার কি করি? সাধকের পদে পদে বিঘ্ন। সকল বিঘ্নের বিচার একদিনে হওয়া কঠিন। আচ্ছা, মন, সে কথা আর এক দিন হইবে। এক্ষণে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহাই চলুক। হাঁ, তাহা হইলে দেখিলাম যে, সময় পাইলেও যে ডাকিতে পারি না তাহার কারণও স্বকর্ম্ম এবং তাহার ঔষধও স্বকর্ম্ম!

ভাল, ডাকিতে পারিনা কেন,—তাহা যেন বুঝিলাম। ডাকি না কেন? ইহা ত এখনও বুঝিতে পারি নাই। ডাকিবার ইচ্ছা আছে, অবসর মিলিয়াছে তবুও ডাকি না,

ইহার কারণ কি? ইহার কারণ? আচ্ছা, অবসর পাইলেও যে ডাকিনা, তা তখন কি করি? অবসরকাল কি ভাবে কাটাই? কোন দিন বা অনুতাপে, আর কোন দিন বা রঙ্গরসে। সে কি প্রকার? স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। যদি অবসর মিলিল ত ভাবিতে লাগিলাম,—জীবনের এত দিন গেল কিছুই করি নাই, এখনও নানা ঝঞ্ঝাটে দিন কাটিতেছে, আর হইবে না, এবার জন্ম বৃথা। এই সকল দুর্ভাবনা আসিয়া প্রাণ পাগল করিয়া তুলে, আর ঈশ্বর ভাবনা ঘটে না। আবার কোন দিন বা অবসরটুকু আমোদ-আহ্লাদে কাটিয়া যায়,—যে আমোদ আহ্লাদে, রসরসিকতায়, সামাজিকতায় কখনও স্থায়ী সুখ পাই নাই তাহাতেই হয়ত অবসর কাটিয়া যায়।

এখানেও অপরাধ আমার নিজের এবং ঔষধও আপন হস্তে। দুর্ভাবনা ত্যাগ করিতে হইবে। শ্রান্ত, ক্লান্ত প্রাণ লইয়া সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। কি ভাবে অবসাদ ত্যাগ করিতে হইবে তাহার আলোচনা বহুপূর্ব্বে একবার "একখানি চিঠি"তে করিয়াছি, সেই পত্রখানিই আজ আর একবার পড়িয়া লইব,—অনর্থক আজ আর সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া কাজ নাই। তবে অপর বিষয়টি একটু বুঝিয়া লইতে হইতেছে।

অন্তরায়—স্বকর্ম্ম।

এই যে রঙ্গরস, রসরসিকতা—ইহার মূল কোথায়? ইহার মূল বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ নহে। ইহার মূল আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। ঈশ্বরকে ভালবাসিবার সাধ সবে প্রাণে নূতন জাগিয়াছে; আর এই রসরসিকতা বহুদিনের প্রিয়-সহচর। ভগবৎপ্রেম অদ্যাপি তাদৃশ বেগবান্ হয় নাই যাহাতে হৃদয়-নদীর তলদেশস্থ রঙ্গরসের শৈবাল সে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে। এখন সাধু সাজিতেছি; এখনও ত সাধু হই নাই। তবেই কথা হইতেছে, "সাধু, সাবধান!" সতত সজাগ প্রহরী হইয়া হৃদয়ের দ্বারে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন কথা ক্ষণতরেও হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিলে হৃদয়ের অন্তঃস্থলেই রঙ্গরসের বীজ ফুটিয়া উঠিবে আর যাহা এযাবৎ ঘটিতেছে তাহারই পুনরবতারণা ঘটিবে। কার্য্য অত্যন্ত দুঃসাধ্য; কিন্তু করিতেই হইবে; নহিলে যে চির অশান্তি।

তাহা হইলে দেখা গেল যে, আমার সাধনপথে যে শত অন্তরায় তাহার কারণ আমার সহস্র-কুকর্ম্ম, এই অন্তরায়ের জন্য দায়ী আমি স্বয়ং,—ঈশ্বর বা আমার কোন প্রতিবাসী ইহার জন্য বিন্দুমাত্র অপরাধী নহেন।

কোমলে কঠোরে।

সে দিন ত বলিলে আমার সকল অন্তরায়ের মূল আমার আপনার কর্ম্ম। আমি ত বুঝিয়াছিলাম যে আমার আপদের হেতু আমি। তোমার উপদেশ শিরে ধরিয়া সংসারে চলিতে যাইয়া ইতোমধ্যেই কিন্তু আমার মনে আবার একটু ধাঁধাঁ উঠিয়াছে। তোমার নিকট আসিলে তুমি চিরদিনই আমার সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়া থাক, তাই আজ আবার ধাঁধাঁয় পড়িয়া এই বিরলে তোমার শরণ লইতেছি। তুমিই মানবের একমাত্র সহায়, তুমিই আর্ত্তের ত্রাণকর্ত্তা,—তোমার চরণ ব্যতীত বিপদে আর কোথায় আশ্রয় চাহিব! তুমি আমার ধাঁধাঁ ঘুচাইয়া দাও। প্রতিদানে আমি তোমাকে কি দিব? এ জগতের সকল দ্রব্যই ত তোমার,—আমি তোমার, আমার সকলই যে তোমার। তবে আর তোমাকে আমি কি দিব? শুনিয়াছি, তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও এক বস্তুর কাঙ্গাল। আর সে বস্তু নাকি মানবের হৃদয়ে অবস্থিতি করে। আচ্ছা, যদি তাহাই হয়—যদি তুমি তাহারই কাঙ্গাল

হও, আর যদি আমার তাহা থাকে, তাহা হইলে আমি তোমাকে তাহাই দিব। এখন লোভে লোভে আমার সমস্যাটির সমাধান করিয়া দাও দেখি।

আবার কি ধাঁধাঁয় পড়িয়াছ---বল। দিনরাত্রি দশজন দশরকম কার্য্যের পরামর্শ করিতে আইসেন। তাঁহাদের জটিল বিষয়-সমূহের নীরস আলোচনায় আমার মূল্যবান সময় বৃথা কাটিয়া যায়,----আমি তোমার সহিত আলাপ করিবার অবসর পাই না। আমার এখনকার ধাঁধাঁ এই।

বেশ ত। দশজন তোমার নিকট আইসেন তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? কখনও একাকী বিরলে বসিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিলে, আবার কখনও বা তাঁহাদের সহিত বসিয়া আমারই কথা আলাপ করিলে?

আমার তাহাতে ক্ষতি কি? আমার খুব ক্ষতি। তোমাকে লইয়া আমার যে সুখ জগতের আর কাহাকেও লইয়া আমার সে সুখ হয় না। তোমার মধুরোজ্জ্বল শ্রীমুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আমার প্রাণ যে সুখ পায়, তোমার চরণকমলে মনভৃঙ্গকে নিলীন করিয়া আমার যে পরম আনন্দ, কাহারও সহিত তোমার আলাপ করিয়াও সেই আনন্দের শতাংশের একাংশ আনন্দও আমার হয় না।

আর আমি ত তোমার কথা কহিতে চাহি না। আমি চাহি তোমাকে হৃদয়ে ধরিতে, আমি চাই তোমার মাঝে আমাকে বিসর্জ্জন দিতে। তুমি বল কিনা লোক আসিলে আমার ক্ষতি কি? আমার শত ক্ষতি, আমার সহস্র ক্ষতি, আমার লক্ষ ক্ষতি, আমার কোটি ক্ষতি।

রাগ কর কেন? যাহা বলিবে শান্ত হইয়া বল না।

রাগ করি কেন? তা' তুমি বুঝিবে কি প্রকারে? একবার যদি তুমি আমি হও, আর আমি তুমি হই, আর তুমি আমার প্রেমে পড়, আর শত চেষ্টাতেও আমাকে হৃদয়ে ধরিতে না পাও, আর তখন যদি তুমি আমার নিকট বেদনা জানাইতে আইস, আর আমি যদি তখন বলি দশজন তোমার নিকট আইসে তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? তাহা হইলে তখন বুঝিতে পারিবে, আমি রাগ করিতেছি কেন? এখন তুমি বুঝিবে না—আমার রাগ হয় কেন?

চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?

আমার পাগলামি শুনিতেছ আর মৃদু মৃদু হাসিতেছ।

কোমলে কঠোরে।

আমার জ্বালা দেখিয়া তোমার হাসি আসিতেছে। তোমার দশা যেন আমার মত হয়।

একেবারে অভিসম্পাত করিতে আরম্ভ করিলে!

ঐ দেখ, আমি কাহাকে কি বলিলাম! তোমার চরণে ধরিতেছি, আমাকে ক্ষমা কর।

ক্ষমা ত চিরদিনই করিতেছি। এখন রাগ দ্বেষ ছাড়িয়া যাহা বলিতেছিলে তাহাই বল। বুঝিয়াছি আমায় লইয়া তোমার যত সুখ আর কাহাকেও পাইয়া তোমার তত সুখ নহে। ভাল। কিন্তু আমাকে লইয়া কি সারাদিন থাকিতে পার?

তোমার চরণ ধ্যান করিয়া, তোমার পবিত্র নাম জপ করিয়া, তোমার লীলা চিন্তা করিয়া, তোমার গুণ আপন মনে গাহিয়া, তোমার কাহিনী অধ্যয়ন করিয়া, প্রকৃতির সর্ব্বত্র তোমার মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া আমি ত সারাদিন কাটাইয়া থাকি তবে আবার ঐ প্রশ্ন করিতেছ কেন?

আচ্ছা, তা ঐ প্রশ্ন না হয় পরিত্যাগ করিলাম। এখন বল দেখি কাহারও সহিত আলাপ করিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?

হইবে না কেন? হয়ই ত। যে সত্য সত্যই তোমাকে ভালবাসে, তাহার মুখে তোমার কথা শুনিবার জন্য প্রাণ

ত পাগল, তাহার চোখে মুখে তোমার প্রেমের আভা দেখিবার জন্য প্রাণ ত সদাই কাঁদে। কিন্তু আমার নিকট যাঁহারা আইসেন, তাঁহারা ত সে শ্রেণীর লোক নহেন। তাঁহাদের কেহ বিনা-আয়াসে তোমায় চাহেন, কেহ সময় কাটে না বলিয়া তোমার কথাবার্ত্তা লইয়া আড্ডা দিতে চাহেন। ইহাঁদের সঙ্গ আমার একেবারেই ভাল লাগে না। আবার কেহ ঘোর সংসারী, কি উপায়ে অর্থ করিবেন, কি উপায়ে মানযশ করিবেন, তাহারই পরামর্শ করিতে চাহেন। ইহাঁদিগের সহিত অধিকক্ষণ থাকিলেই আমার অসুখ হয়।

যদি ইহাঁদিগকে তোমার ভাল না লাগে, তবে ইহাদিগকে তুমি ত্যাগ করিলেই পার। ইহা আর সমস্যা কি?

ত্যাগ করি কি প্রকারে? তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইলে তাঁহারা আর আমাকে জ্বালাতন করিতে আসিবেন না এই মনে করিয়া কোন কার্য্য সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিলাম, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম মিটিয়া গেল। আবার দেখি দু'দিন পরে নূতন বিষয় লইয়া আসিয়া উপস্থিত। তাহার ব্যবস্থা করিলাম; চলিয়া গেলেন। ভাবিলাম, বার বার আর আসিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের

লজ্জা নাই। দু'দিন পরে আবার আর একটি বিষয় লইয়া উপস্থিত। বিনয়সহকারে বহুবার নিবেদন করিয়াছি যে আমার শরীর ও মন সংসারের উপযোগী নহে। তাঁহারা যদি দয়া করিয়া আমাকে একটু ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে আমি পরম অনুগৃহীত হইব। উত্তরে পরমবিজ্ঞের ন্যায় মৃদু হাসিয়া আজ্ঞা করেন "আরে! কর, একটু কর, একেবারেই কিছু করিবে না।" উত্তর শুনিয়া মনের মধ্যে যাহা হয় তাহা সংবরণ করিলেই শক্তি বৃদ্ধি হয় এই জন্য তাহা আর প্রকাশ করিলাম না।

সমুচিত উত্তর দিলে পাছে অবিনয় হয় এই ভয়ে সমগ্র জীবন নীরবে এই জ্বালায় জ্বলিতেছি। আর যাঁহারা আমার নিকট আইসেন তাঁহাদের অধিকাংশই আমারই ন্যায় ভক্ত। আমাদের হৃদয়ে বৈরাগ্য নাই, দেহসুখে মন পূর্ণ, অহঙ্কার ষোল আনা, অথচ আমাদের ধারণা আমরা প্রেমিক। শতদিন ত্যাগের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেও আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও বৈরাগ্য ফুটে না, এবং বৈরাগ্যের সাধনাও আমরা করি না। আমি চাহি বিরলে বসিয়া ভক্তগণের গরিমা ধ্যান করিয়া করিয়া আমার ভণ্ডামি নাশ করিতে। আমারই ন্যায় ভণ্ডের সহিত বসিয়া ভণ্ডামি করিতে আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই, তবুও

তাঁহাদের সঙ্গ আমাকে করিতে হয়---আমার ধাঁধাঁ এই। আমার কোন্ কর্ম্মফলে আমার এই বিড়ম্বনা, প্রভু? আর কি উপায়েই বা আমি ইহার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, জননি?

তোমার এই বিড়ম্বনা তোমার নিজের ভুলে। যাঁহাদিগের সহবাসে তোমার আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়, তুমি তোমার হৃদয়ের কোমলভাবশে তাঁহাদিগকে উচিত কথা বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পার না। কোমলতা ভাল জিনিষ। কিন্তু কিছুরই অতি ভাল নহে। এই কোমলতারও অতি ভাল নহে। ঘোর কলিযুগ পড়িয়াছে। এই যুগে মানুষ স্বার্থান্ধ। কোমল ব্যক্তির উপর এই কালে নিত্যই অবিচার বর্ষিত হইতেছে। যাহারা সংসারের কীট তাহারা ধীরে ধীরে এই কোমল কুসুমে প্রবেশ করিতেছে এবং আপন পুষ্টির জন্য নির্দ্দয়রূপে কুসুমের প্রাণ সংহার করিতেছে। কলির কুটিলতার ভয়ে ভীত হইয়া ঋষিগণ নৈমিষারণ্য আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন। কলির প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে স্থানবিশেষে তোমাকেও একটু কোমলতা কম করিতে হইবে। এতকাল কোমল থাকিয়া এত ভুগিলে, এখন ক্ষেত্রভেদে একটু কঠোর হইয়া দেখ, কষ্ট কমিতে পারে। আর এই স্থান বিশেষে একটু

কোমলে কঠোরে।

কঠোর হইতে বেদনা বোধ কর কেন? শাস্ত্র ত তারস্বরে বলিতেছেন সাধককে কুসুম অপেক্ষাও কোমল এবং বজ্র অপেক্ষাও কঠোর হইতে হইবে। অবিচারিতচিত্তে শাস্ত্র-বাক্য মান না, তাই এত দিন এই কষ্ট পাইতেছ। শাস্ত্র-শাসন অবনত মস্তকে গ্রহণ কর, যাতনা দূর হইবে। তাই বলিতেছি, তাঁহার জন্য একটু কোমলে কঠোরে হও।

পঙ্কজিনীর পূজার পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

ভবানীপুর।
২রা আশ্বিন, ১৩৩০।

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবী
ভগিনী চিরায়ুষ্মতীষু,—

পরমশুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকবিজ্ঞাপন—

বহুদিন পূর্ব্বে তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি, পঙ্কজ। আজিও তাহার উত্তর লিখি নাই। উত্তর দেওয়া আবশ্যক এমন কোন বিষয় তোমার লিপিতে নাই তাহা নহে। অনেক কথা লিখিয়াছ যাহার উত্তর তোমার একান্ত প্রয়োজনীয় তবুও এতদিন উত্তর দেই নাই। হয়ত ভাবিতেছ তোমার পত্রের কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু তাহা নহে, ভগিনি। পত্রের কথা আমার মনে আছে, পত্রখানি পড়িয়াছিও কয়েকবার, উত্তরের যে তোমার প্রয়োজন তাহাও বেশ বুঝিতেছি তবুও এতদিন উত্তর লিখি নাই। আজিও যে কাগজ কলম লইয়া

আরম্ভ করিয়াছি ইহাও বিশেষ ইচ্ছাবশতঃ নহে,—উত্তর না দিলে নহে তাই আজ এই পত্র লিখিতেছি।

তোমার হৃদয় যেরূপ কোমল তাহাতে এইটুকু পড়িতে না পড়িতেই হয়ত তুমি কাঁদিয়া ফেলিবে,—তুমি হয়ত মনে করিবে যে এতদিনে আমি তোমাদের মায়া-মমতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছি, অতি সত্বরই দোকানপাট বন্ধ করিয়া এতদিনের ঘরকন্না তুলিয়া গহন বিপিনে প্রবেশ করিয়া গভীর সাধনা আরম্ভ করিব। নহিলে যে আমি তোমাকে এত ভালবাসি সেই আমি তোমার পত্রের উত্তর দিতে এত বিলম্ব করিব কেন? আর উত্তর লিখিতে আমার ইচ্ছাই বা হইতেছে না কেন? কেবল উত্তর না দিলে নহে তাই উত্তর দিতেছি, এমন কঠোর কথা লিখিব কেন? নিশ্চয়ই আমি এতদিনে সকল বন্ধন কাটিয়াছি, নহিলে প্রিয়জনকে এমন অপ্রিয় কথা লিখিব কেন?

কি কারণে এতদিন তোমার পত্রের উত্তর দেই নাই, আজ উত্তর লিখিতে বসিয়াও বা কেন প্রাণ ফুটিতেছে না তাহা বলিবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে চিরদিনের মত একটি কথা বলিয়া রাখি। কথাটি বুঝিয়া হৃদয় হইতে মিথ্যা ভয় চিরতরে দূর করিয়া দিও। তোমরাও তাহাতে শান্তিতে থাকিতে পারিবে, আমিও একটু শান্তি লাভ করিব।

তোমাদের মনে একটা ভয় আছে যে একদিন আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া তপস্যা করিতে গিরিগহ্বরে বা বিজন বিপিনে প্রবেশ করিব।

যখনই তোমরা দেখ যে আমি আমার রঙ্গরসের মাত্রা একটু কম করিয়াছি তখনই তোমরা হাসি মুখ আঁধার করিয়া ভাবিতে ব'স যে তোমাদের গুণের দাদা আর তোমাদের কাছে থাকিবে না, দুই এক দিনের মধ্যে গভীর নিশার অন্ধকারে দেহ লুক্কায়িত করিয়া তোমাদের নয়নপথ হইতে চিরতরে অদৃশ্য হইবে, তোমরা এই কথা একবারও মনে কর না যে তোমাদের আদরের দাদা এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, শোকে দুঃখে যাতনায় ভাবনায় তাহার রঙ্গরস মরিয়া আসিতেছে।

যখনই তোমরা দেখ যে মাসের মধ্যে ঊনত্রিশ দিন তোমাদের অন্নপূর্ণাসম সুস্বাদু রান্না খাইয়া, ত্রিশ দিনের দিন কচি আম্রের ঝোলে একটু অধিক অম্লরস অনুভব করিয়া তোমাদের দাদা রাসভের ন্যায় চীৎকার করিয়া তোমাদিগকে দুর্ব্বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছেন না তখনই তোমরা মনে প্রমাদ গণনা কর, তখনই তোমরা ভাব যে আর বিলম্ব নাই, তোমাদের কপাল সত্বর ভাঙ্গিবে,—এত গুণের গুণনিধি সত্বরই ফাঁকি দিবে। আরে বোন্, এটা

পঙ্কজিনীর পূজার পত্র।

তোরা একবারও ত ভাবিস্ না যে একদিনও ত অগ্নিমান্দ্য হইতে পারে,—যৌবনে তোমাদের রাক্ষস ভাই যে প্রকার গিলিয়াছে এখন বার্দ্ধক্যে সকল দিন সেই প্রকার গিলিবার ক্ষমতা নাও থাকিতে পারে?

যে দিনই তোমারা দেখ যে তোমাদের বিলাসময় ভ্রাতা পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না করিয়া মস্তকে মনোমোহন সিঁথি না তুলিয়া, অধর তাম্বুলরাগে রঞ্জিত না করিয়া বসন্তের সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে বাহির হইয়া গেলেন সেই দিনই তোমরা অন্তঃপুরে বসিয়া ভাবিতে থাক যে এতদিনে সেই মহাদুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল। আচ্ছা, পঙ্কজ, এটা কি তোদের মনে একবারও জাগে না যে যাহার বিশেষ আয় নাই, যে তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যাপ্তরূপে সংগ্রহ করিতে পারে না সে নিত্য নিত্য সুন্দর পোষাক পাইবে কোথায়? এটা কেন তোমরা বুঝিতে পার না যে, এই যে পোষাক পরিচ্ছদে অযত্ন এইটি বৈরাগ্যবশতঃ নহে, সম্পূর্ণ অভাবসম্ভূত? এ'টা কেন তোমরা ধরিতে পার না যে এই যে কেশের অনাদর ইহা বৈরাগ্য-জনিত নহে; মস্তকে টাক পড়িয়াছে—এখন আর সিঁথি তেমন উঠেনা তাই সকল দিন যত্ন আদর করা হয় না? এই যে

অধরে তাম্বুল রাগের অভাব এইটি তোমাদের দুর্দ্দিনের পূর্ব্বচিহ্ন নহে, এইটি গলিত দন্তের পরিচয় এবং সেই শেষের সে দিনের পূর্ব্বচিহ্ন—এই সহজকথাটিও বা তোমরা বুঝ না কেন?

যদি দেখ যে কোন দিন সান্ধ্য ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বিলম্ব হইতেছে—ফিরিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্থির করিয়া ব'স যে আজ ফাঁকি দিয়াছে, আর আসিবে না; অমনই ছুটিয়া দাদার প্রমোদ-কক্ষে প্রবেশ কর এবং অশ্রুপ্লাবিতগণ্ডে শেষ পত্রের জন্য অনুসন্ধান কর, এবং যখন পত্রাদি কিছু না পাও তখন এই বলিয়া দুঃখ কর যে, সকল মায়া পাশ ছিন্ন করিয়া যে চলিয়া গেল সে যাইবার সময় আর কোন্ স্নেহ-বশে বিদায়-পত্র রাখিয়া যাইবে। দেখ, তোমরা ত অনেকবার দেখিয়াছ যে যে সময় তোমরা সাশ্রুনয়নে নবীন-সন্ন্যাসী-পরিত্যক্ত কক্ষ ধূপ ধুনা দ্বারা ভক্তিভরে আমোদিত করিতেছ সেই সময় তোমাদের নবীন সন্ন্যাসী কণ্ঠে সুরভি বেলফুলের হার পরিয়া হস্তে ম্যাগ্নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরার স্তবক ধরিয়া আপন মনে হেলিতে দুলিতে গৃহে প্রবেশ করেন। আচ্ছা, তবুও তোমাদের ভ্রম যায় না কেন?

যদি কোনদিন তোমরা দেখ যে তোমাদের বুড়া

পঙ্কজিনীর পূজার পত্র।

ইয়ার মধ্যাহ্নে আহারাদির পর তোমাদের কক্ষে গোলক ধাম খেলিতে না বসিয়া আপন কক্ষে গমন করতঃ কবাট অর্গলাবদ্ধ করে তাহা হইলে তোমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পরস্পর বলাবলি কর যে "মহাযোগ আরম্ভ করিল, আর কয় দিন ?" এ'টা কি তোমাদের একবারও মনে আসে না, পঙ্কজিনি, যে অভ্যঙ্গ তৈল-মর্দ্দনের পর গঙ্গা-প্রবাহে অবগাহন স্নান করায় দেহ শীতল হইয়াছিল, তাহার পর চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় সেবন করিয়া প্রাণ সুশীতল হইয়াছে, এখন আবেশে অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে। তাই এই চৈত্র মাসের দ্বিপ্রহরের গ্রীষ্মে বৈদ্যুতিক পাখা চালাইয়া তাহার নিম্নস্থ আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়া তোমাদের যোগী ভ্রাতা যোগনিদ্রা মগ্ন আছেন ? তোদের নিয়ে আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি,—প্রতিমুহূর্ত্তেই তোরা ভাবিতেছিস যে আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম আর কি !

যদি তোমরা দেখ যে তোমাদের অগ্রজ কোন রজনীতে নৈশভোজনান্তে, গৃহশীর্ষে, শান্তোজ্জ্বল-তারকারাজি-খচিত, সুনীল গগন-তলে সুখের আসন বিস্তারিত করিয়া, সুখস্পর্শ-মৃদু-মধুর-মলয়-মারুতসেবিত হইয়া মৃদু-মধুর সঙ্গীত করিতেছেন তাহা হইলে তোমরা তোমাদের আহার অর্দ্ধ-

সম্পন্ন করিয়াই উঠিয়া কোন্ কৌশলে আমার এই বৈরাগ্য-সঙ্গীত বন্ধ করিতে পার তাহার পরামর্শ করিতে বস। দেখ, এমন মিথ্যা ভয়ে ভীত হইয়া সমগ্র জীবন অশান্তি-সাগরে ভাসাইয়া দিও না। এ'কথা কি তোমাদের মাথায় আইসে না যে রসনাতৃপ্তিকর, বহুবিধ, সুখাদ্য আহার করিয়া তৃপ্ত প্রাণে রজনীতে যখন গৃহচ্ছাদে উপবেশন করি, যখন কুসুম-সৌরভ-সুরভিত দক্ষিণ বায়ু ধীরে ধীরে অঙ্গ আলিঙ্গন করে, যখন অনতিদূরস্থ বৃক্ষাবলীর পত্রপুষ্পাভ্যন্তর হইতে কোকিলবধূ উদাস প্রাণে তাহার সুধাসম প্রাণ দ্রবীভূত করিয়া সঙ্গীত ধারায় ঢালিয়া দিতে থাকে, যখন সুন্দরী-শিরোমণি অযুত অপ্সরা তারকারূপে গগনমণ্ডলে বসিয়া বিলাসের হাসি ছড়াইতে থাকে তখন তোমাদের সন্ন্যাসীর সংযম চ্যুত হয়, অতৃপ্ত বাসনাদি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, যৌবনের শক্তিপ্রভাবে যে প্রবল রিপুকুল হেটমুণ্ড হইয়াছিল এই বলহীন বার্দ্ধক্যে সুযোগ পাইয়া তাহারা মস্তকোত্তলন-পূর্ব্বক স্ব স্ব শক্তির পরিচয় দেয়, তোমাদের দাদা তাই লোকলোচনের অন্তরালে বসিয়া নিজমনে গুণগুণস্বরে এক-খানি "বিদ্যাসুন্দর" গাহিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইতেছেন?

যদি দেখ যে নিশার আঁধারে একান্তে একাকী বসিয়া নিঃশব্দে নয়ননীরে ভাসিতেছি তবে তখনই ভাবনা-সাগরে

ডুবিয়া যাও,—এই যে প্রেম-প্রবাহ বহিতেছে নিশ্চয়ই ইহা অচিরে তোমাদের বাল্য-সহচরকে ভাসাইয়া কোন্ দূরদেশে কোন্ সাগরমাঝে লইয়া যাইবে, আর তোমরা দেখিতে পাইবে না! তোমরা ত অন্য সময় বেশ বুঝিতে পার, পঙ্কজ; কেবল আমার বেলায় জ্ঞান হারাও। "সংসার-দহনে কাঁদি আমি, লোকের কাছে প্রেমিক হই" এই গানটির ত অনেক আদর কর তবে আমার রোদনের অর্থ বুঝিতে পার না কেন? বৃদ্ধ বয়সে অতীতের স্মৃতি বড় জ্বালা দেয়. হেলায় দুর্ল্লভ মানবজন্ম হারাইয়াছি তাই কাঁদি, বহিন্,—ও প্রেমাশ্রু নহে, পঙ্কজিনি!

সামান্য অসুখ হইতে না হইতেই যখন তোমরা আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অক্লান্তভাবে আমার সামান্য বেদনা দূর করিবার জন্য শত চেষ্টা কর তখন যদি তোমাদের সামান্য ত্রুটি দেখিয়া তোমাদের সুখ-দুঃখ-সহিষ্ণু ভ্রাতা মহাগর্জ্জন করতঃ "অঁাকাইয়া ঝঁাটা" মারিবেন বলিয়া তোমাদিগকে স্নেহ-সম্ভাষণ না করেন তাহা হইলে তখনই তোমরা বিষাদে আচ্ছন্ন হও,—"হায়! এত সহিষ্ণুতা যা'র সে আর কতদিন সংসারাশ্রমে বাস করিবে!" দেখ, পৃথিবীর মানব মানবী সকলেই দেব দেবী না কি? তোমাদিগকে দেখিলে অনেক সময় এই প্রকার একটা সন্দেহ মনে জাগিয়া উঠে। তবে

সে সন্দেহ বেশীক্ষণ থাকে না। যখনই মনে পড়ে যে মানব-মানবীর মধ্যে শর্ম্মাও আছেন তখনই ভ্রান্তি দূর হয়, তখনই সম্যক্ প্রকারে বলিতে পারি যে সকল মানব মানবীই দেব দেবী নহেন। ঐ যে সহিষ্ণুতা দেখিতে পাও উহা সংসার-পরিত্যাগের পূর্ব্ব লক্ষণ নহে। উহার নানা কারণ। তোমাদের শত যত্ন মাঝে যদি মুহূর্ত্তের চ্যুতি ঘটে তবে তাহাতে বাক্যবাণে তোমাদের স্নেহময় হৃদয় বিদ্ধ করিতে নাই। আর রোগ ত স্বকর্ম্মফল, কর্ম্মফল ভোগ করিবার সময় অসহিষ্ণু হইলে স্বকর্ম্ম কি তাহার ক্রিয়া বন্ধ করিবে? যদি কোনদিন রোগের সময় শান্ত হইয়া থাকিতে দেখ, তবে আর তাহাকে গৃহত্যাগের পূর্ব্বচিহ্ন মনে করিও না। আর ইহাকেই যদি সহিষ্ণুতা বল তবে এই সহিষ্ণুতা দেখিয়া সন্ন্যাসী হইব এমন মনে করার কারণ ত তোমা-দের কিছুই দেখি না। এই সহিষ্ণুতা অপেক্ষা যাহাদের সহিষ্ণুতা শতগুণে অধিক তাহারা ত আজিও সন্ন্যাসিনী হইয়া যায় নাই। সুখময় পিতৃগৃহে লালিত পালিত হইয়া, কৈশোরেই দুঃখের সংসার পাতাইয়া, কতজন ত কেমন হাসিমুখে জীবন যাপন করিতেছে। তোমার দাদার ধৈর্য্য অপেক্ষা তাহাদের ধৈর্য্য ত লক্ষ গুণে অধিক। কৈ, তাহারা ত সংসার ত্যাগ করে নাই। তাহারা ত বেশ হাসিমুখে

শ্বশুর শাশুড়ী, দেবর ভাসুর, জা ননদ লইয়া দুঃখের সংসার সুখের আগার করিয়া কাল কাটাইতেছে। আর তাহাদের লক্ষাংশের একাংশ সহিষ্ণুতা যদি আমাতে দেখ অমনই আমার অপার বৈরাগ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠ কেন? যদি বল আমার অপেক্ষা সহিষ্ণু লোক তুমি দেখ নাই,—আমার এইরূপ মিথ্যা প্রশংসা করা তোমাদের স্বভাব,—তাহা হইলে আমি তোমাকে সেই প্রকারের লোক দেখাইতে পারি।

হয়ত এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই তুমি আনন্দে আটখানা হইবে;—ভাবিবে দাদা বুঝি আবার ভাল এক সাধুর সন্ধান পাইয়াছে, সত্বর বুঝি তোমাকে বাটী লইয়া সেই সাধুকে দেখাইবে, তোমার দাদার কত গুণ, তোমাদের উপর তাঁহার কত ভালবাসা, পোড়া ঈশ্বর যদি ভূতের ন্যায় দাদার ঘাড়ে না চাপিত তাহা হইলে তোমাদিগকে তোমাদের দাদা কত সুখীই করিত! সে যাহাই হউক, আমার অপেক্ষা সহিষ্ণু লোক যদি তুমি দেখিতে চাও তাহা হইলে আমি তোমাকে দেখাইতে পারি। তবে তিনি সন্ন্যাসী নহেন, সন্ন্যাসিনী। আর সেই জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভাত-শুক্র-তারারূপিণী সন্ন্যাসিনীকে দর্শন করিবার জন্য পুণ্য শ্বশুরালয় হইতে দাদার গৃহে আসিতে হইবে না।

তোমার শ্বশুর-গৃহেই আমি তাঁহাকে দেখাইব। আমি যাহা বলিতেছি তাহা করিও,—মুহূর্ত্তেই তিনি তোমাকে দেখা দিবেন। এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই হয়ত ভাবিবে দাদা বুঝি এইবার স্বর্গলোক হইতে দেবীকে মর্ত্ত্যলোকে আনিতে শিখিয়াছেন, এতদিন মানুষ অজ্ঞান করিয়া প্রেতাত্মা আনয়ন করিয়া আলাপ করিতেন, এইবার সজীব দেব-দেবী স্বর্গ হইতে আনিতে শিখিয়াছেন, পরমেশ্বর দাদাকে আর কিছুকাল বাঁচাইয়া রাখিলে দাদা মর্ত্ত্যকে স্বর্গ করিয়া ফেলিবেন। আমার সম্বন্ধে তোদের এই প্রকার একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে। তোদের দাদা সেই ভুল ধারণা দূর করিয়া দিতে ইচ্ছুক নহে। কারণ, তোমরা যদি দাদার দীর্ঘজীবন কামনা কর তাহা হইলে দাদা এই বৃদ্ধ বয়সে আরও কিছুদিন বাঁচিতে পারে। সতীর প্রার্থনায় কি না হয়? সাবিত্রীর প্রার্থনায় কত কাণ্ডই হইল। অন্ধ শ্বশুর শাশুড়ী চক্ষু লাভ করিলেন, রাজ্যলাভ করিলেন, অপুত্রক পিতা পুত্র লাভ করিলেন, মৃত স্বামী জীবন পাইলেন, সাবিত্রী শত পুত্রের মাতা হইলেন। শ্রেষ্টিসুত লক্ষিন্দরের গলিত, ক্রমিকীটালয়, ছিন্নভিন্ন দেহাংশে বেহুলা সতী জীবন সঞ্চার করিলেন, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত দেহাংশগুলি স্বতই আসিয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল, ক্রমিকীট দূরে পলায়ন

করিল, মানবদেহ দেবকান্তি লাভ করিল,—লক্ষিন্দর নবজীবন লাভ করিয়া নারীরত্ন বেহুলাকে লইয়া শান্তিতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সতীর প্রার্থনায় জগতে সকলই হইতে পারে। তোমাদের দাদা আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে মর্ত্ত্যে স্বর্গরাজ্য আনয়ন করিবে এইরূপ সম্পূর্ণ অমূলক ধারণা বশেও তোমরা যদি আমার দীর্ঘজীবন কামনা কর তবুও আমি তোমাদের সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিতে রাজী নহি। কারণ আরও কিছুদিন ইহধামে আমি থাকিতে চাই। যতদিন তোমরা ইহধামে থাকিবে ততদিন আমি এস্থানে থাকিতে চাই। ইহা পড়িয়া মনে করিও না যে আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। তোমরা যাবৎ বাঁচিবে আমি যে তাবৎ বাঁচিতে চাহি তাহার কারণ এই নহে যে আমি তোমাদিগকে ভালবাসি, তাহার কারণ আমি আমাকে ভালবাসি। অর্থাৎ পাপ করিয়াছি অনেক, মৃত্যু হইলে ফলভোগের জন্য জন্ম অবশ্যম্ভাবী, অন্য জন্মে যদি তোমাদের ন্যায় স্নেহময়ী ভগিনী না পাই তবে ত এত আদর যত্ন মিলিবে না, তাহা হইলে এমন গুণহীনকে ত কেহ এত ভালবাসিবে না, তখন ত বড় কষ্টে পড়িব। তাই যত বেশী দিন তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পারি ততই আমার লাভ, তাই এই বৃদ্ধ বয়সেও আরও কিছুদিন

বাঁচিবার সাধ। সে যাহাই হউক, সেই যে জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ন্যাসিনীর প্রসঙ্গ করিতেছিলাম তাঁহাকে দেখিবার জন্য নিশ্চয়ই তুমি উৎসুক হইয়াছ। তা বেশ। একটু পরেই প্রক্রিয়া বলিতেছি, প্রক্রিয়া করিলেই তিনি তোমার নয়ন সমীপে তাঁহার মধুময়ী মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হইবেন। আমি যতদূর বুঝিতেছি তাহাতে তুমি অধিকক্ষণ তাঁহার তেজঃ-পুঞ্জ কলেবর প্রতি চাহিয়া থাকিতে পারিবে না। প্রক্রিয়া বলিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসিনীর পরিচয় একটু দিতেছি। সাধু-সন্ন্যাসী-দর্শনকালে হৃদয় ভক্তিপূর্ণ থাকিলে উপকার হয়। লোকের গুণাবলীর কিয়দংশও অবগত হইতে পারিলে তাঁহাদের প্রতি স্বতই ভক্তি জন্মে। আমি জানি সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি, তবুও উক্ত কারণে সন্ন্যাসিনীর একটু পরিচয় দিতেছি। সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গেই তাঁহার প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, তাঁহার সহিষ্ণুতার দুই একটি কথা আমি বলিতেছি। ব্রাহ্মণের কন্যা। ত্রয়োদশ বর্ষে বিবাহ হয়। বিবাহের "কনে" স্বামীর ঘর করিতে গমন করিলেন। শ্বশুরগৃহে একদিন থাকিতে না থাকিতেই বুঝিতে পারিলেন যে স্বামী মদ্যপানরত। যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন তাহাত উড়িয়া যায়ই, অধিকন্তু স্নেহময়ী জননীর অর্থও অপব্যয়িত হয়। কিশোরী যে সুখের কল্পনা বুকে

করিয়া সাধের স্বামী-সোহাগ ভোগ করিবার আশায় বিবাহের কুসুমমালা কণ্ঠে ধরিয়া পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন সেই পুষ্পহারগ্রথিত কুসুম-কলিকা নিদাঘতাপে নীরস হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ের আশা-সরসী বিষাদতাপে শুষ্ক হইয়া উঠিল। শ্বশুরগৃহে আসিবার দুইদিন পরেই গভীর রজনীতে যখন সুরাপহৃত-চেতন স্বামীর ছিন্ন-ভিন্ন, ক্ষত-বিক্ষত দেহ সকলে ধরাধরি করিয়া নববধূর শয়নকক্ষে ফেলিয়া দিয়া গালাগালি দিতে দিতে চলিয়া গেল তখন কিশোরী তন্দ্রাবিজড়িত চক্ষে মাংসপিণ্ড অবলোকন করিয়া ভীতা হইলেন। মুহূর্ত্তেই বুদ্ধিমতী কিশোরী স্বীয় ভাগ্যবিড়ম্বনা বুঝিতে পারিলেন। বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ছুটিতেছিল, অর্দ্ধপথে তাহাকে নিরোধ করিলেন। নয়ন ফাটিয়া অশ্রু-প্রবাহ বহিতে যাইতেছিল, কঠোর শাসনে প্রবাহকে অন্তর্ম্মুখী করিলেন। স্বামীর মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইলেন। ক্ষতস্থান শীতল জলে প্রক্ষালিত করিয়া নিজ বহুমূল্য বস্ত্রের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া জলপটি বাঁধিলেন, চক্ষুতে ও মুখে জল সেচন করিলেন, অঙ্গে হস্তামর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপ সুখেই তাঁহার নবজীবন আরম্ভ হইল এবং এইরূপ সুখেই নিত্যই কাটিতে লাগিল। পিতৃপ্রদত্ত অলঙ্কার-রাশি শীঘ্রই বরাঙ্গ হইতে

স্থানান্তরিত হইল। তুষার-শুভ্র ললাটের লোহিত সিন্দূর-বিন্দু আর হস্তের লৌহ খাড়ুই সধবার চিহ্ন-স্বরূপ রহিল। সুখ-শর্ব্বরী এইরূপ প্রেমবিলাসে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতেই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতেন। বিশেষ কষ্টকর রান্না করিতে না পারিলেও মোটামুটি রান্নাগুলি করিতেন। গরম দুগ্ধের কটাহ গৃহ হইতে গৃহান্তরে লইবার সময় একদিন হাত হইতে কটাহ পড়িয়া যাওয়ায় সমগ্র বামাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যায়। দগ্ধদেহ নীরবে পরিধেয়বস্ত্রাবৃত করিয়া নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। এই ভাবে বিবাহিত জীবন চলিতে লাগিল। দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হইল। অস্ফুট-কোরক-সম তনয়দ্বয় বাল্যেই এই সংসার ত্যাগ করে। সহিষ্ণুতা দেখিয়া ঈশ্বরের কৃপা হইল। স্বামীর মন পরিবর্ত্তিত হইল,—তিনি আসব ত্যাগ করিলেন, স্ত্রীকে বিশেষ আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। পরের ঘটনা আমি আর জানিতে পারি নাই। তিনি রমণী, আমি পুরুষ,—পুরুষের নিকট রমণী সকল কথা প্রকাশ করেন না, বিশেষতঃ বিবাহের পর এবং শ্বশুরালয় সম্বন্ধে। তুমি রমণী, রমণী-হৃদয় রমণীর নিকট খুলিতে পারে,—তাঁহার অন্যান্য সংবাদ তুমি জানিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে যাহা বলিতেছি তাহা করিও, তাহা হইলে এই

সহিষ্ণু সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইবে। প্রাতে যখন স্নানান্তে রক্ত-বস্ত্র পরিধান-করতঃ দৈনন্দিন পূজা সমাপন করিয়া চন্দনের ফোঁটা পরিয়া ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইবে তখন তোমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিও। সেই ঘরে যে বৃহৎ দর্পণ আছে তাহার সম্মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসিনীকে ভক্তিভরে চিন্তা করিয়া চক্ষু খুলিবে। মুকুরে সেই স্বর্ণপ্রতিমা সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইবে। তাঁহাকে দেখিলে তুমি বুঝিতে পারিবে তাঁহার তুলনায় তোমার দাদা একান্ত অসহিষ্ণু।

তোমরা যখন দেখ যে দিনের পর দিন অনুরোধ করিয়াও তোমাদের দাদাকে দিয়া একটিও কবিতা বা গল্প লেখাইতে পার না তখন তোমরা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়, মনে ভাব এতদিনে দাদা তাহার চরিত্রের শেষ দুর্ব্বলতাও জয় করিয়াছে, যখন সকল মায়া মোহ পরিত্যাগ করিয়াছিল তখনও সাহিত্যালোচনা, যশোলাভ-লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, এতদিনে সেই একমাত্র দুর্ব্বলতাও পরিত্যাগ করিল, এইবার ভাসিবে। আচ্ছা, পঙ্কজ, এ'টি কি তোমরা বুঝিতে পার না যে তোমাদের দাদা সরস্বতীর বরপুত্র নহেন, তাঁহার প্রতিভা নাই, তাঁহার ঘটে যেটুকু বিদ্যা ছিল তাহা দুইদিনে নিঃশেষ হইয়াছে, তাই তিনি

শত অনুরোধেও এখন এক পংক্তি লিখিতে চাহেন না। এই যে কাব্যে অনাদর ইহা বৈরাগ্যজনিত নহে, ইহা অন্তঃসারশূন্যতা-প্রসূত, জানিও।

তোমরা যখন দেখ যে গ্রামের কোন তরুণ যুবক যখন মহানন্দে এক তরুণীকে বিবাহ করিয়া বাদ্যোদ্যমে গ্রাম মুখরিত করিয়া নববধূ লইয়া প্রীতিভরে গৃহে প্রত্যাগমন করে, যখন গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা নববধূর চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার জন্য পাগলের ন্যায় ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তখন তোমার অগ্রজ বহিরঙ্গণে দাঁড়াইয়া বেহারাদের তামাকের ব্যবস্থা করিতে থাকেন বা বাদ্যকরগণকে অস্থানে বাহবা দিয়া নিরুৎসাহিত করিতে থাকেন, তোমাদের শত টানাটানিতেও নববধূর মুখ দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন না, তখন তোমরা তোমাদের আদরের পার্শী শাটী খুলিয়া ফেল, সাধের বাঁধা চুল এলাইয়া ফেল, মুখের হাসি ম্লান করিয়া ভাব যে দাদা সত্বরই তোমাদের মুখদর্শনও ত্যাগ করিবে, ছার নারীর মুখ আর দেখিবে না—এইবার কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী হইল। ভগিনি, তোমার ভ্রাতা যে কেন দৌড়াইয়া নববধূর পুণ্যমুখ দেখিতে যায় না তাহা তোমরা বলিতে পার না কেন? তোমরা ত মনে করিলে পার যে তোমার দাদার স্ত্রী সুন্দরী নহেন, অন্যের সুন্দরী

স্ত্রী দেখিলে নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া দুঃখ হয় তাই তোমাদের দাদা আর নববধূর মুখ দেখেন না।

বহিন্, কতকাল আর এইরূপে ভয়ে ভয়ে দিন যাপন করিবে? তোমাদের কষ্ট দেখিয়া আমার কষ্ট হয়। তোমরা ভয় ত্যাগ করিয়া শান্ত হও, আমিও শান্ত হই। পঙ্কজ, ভুলিয়া যাও কেন যে, "যে মূলা বাড়ে তার পাতা দেখ্‌লে চেনা যায়,"—যে বড় হয় সে প্রথম হইতেই তাহার চিহ্ন প্রকাশ করে। তোমরা ত লেখাপড়া জান, জগতের ইতিহাস ত তোমাদের অবিদিত নহে, একবার স্মরণ কর ত ধর্ম্মজগতে যাঁহারা উন্নতি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বৃদ্ধ বয়সেও কাজ আরম্ভ করেন নাই। তবে আর ভয় কেন? এই বৃদ্ধ বয়সে এত বাসনা সত্ত্বেও এই সুখ-পালিত দেহ লইয়া বিলাসকক্ষ পরিত্যাগ করিবার শক্তি হয় কি বোন্? যে সমগ্রজীবন সন্ন্যাসী হওয়ার কল্পনা করিয়া কেবল উদ্যোগ করিতেই থাকে, কাপড় গৈরিক করিতেই থাকে সে কি কখনও গৃহত্যাগ করিতে পারে? সে কি কখনও বিশ্বাসের ভূমিতে স্থির হইয়া সংসারের দ্বার ত্যাগ করতঃ ঈশ্বরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইতে পারে? যৌবন উপার্জ্জনের সময়,—যৌবনে যত কষ্ট করা যায়, যৌবনে যত

পরিশ্রম করিতে পারা যায়, যৌবনান্তে কি আর তত কষ্ট, তত পরিশ্রম করিতে পারা যায়? যৌবনে যে পরিমাণে উৎসাহ, অধ্যবসায় থাকে যৌবনান্তে কি আর তাহা থাকে? যৌবনই যুদ্ধের সময়, যৌবন অতীত হইলে যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে না। বৃদ্ধকে যে পার্থিব যুদ্ধেও সৈনিক দলে গ্রহণ করা হয় না, সে কি আর আধ্যাত্মিক যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে? সংস্কার বড় শক্তি ধরে, পঙ্কজ; সংস্কার জয় করিতে হইলে বিশেষ শক্তির আবশ্যক,---সে শক্তি বৃদ্ধ কোথায় পাইবে?

এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমার সন্ন্যাস-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইও, পঙ্কজিনি। সে অমূল্য ধন এমন হেলায় লাভ করা যায় না, পাঁকী! আমার সন্ন্যাসেরও যেমন ইতি তোমার পত্রেরও তেমনই ইতি। এখন বিদায় লইতেছি, স্নেহময়ী ভগিনি আমার!



আমার দুঃখ।

বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের অনলতাপে সন্তাপিত বহু নরনারী দিবাবসানে ভাগীরথীশীকরসম্পৃক্ত-সমীরণ-স্পর্শে শীতল হইবার আশায় পুণ্যধাম বারাণসীর অতীত-গৌরব-চিহ্ন দশাশ্বমেধঘাটে উপবিষ্ট ছিলেন। একটী মুণ্ডিত-মস্তক, গৈরিক-বসন-ধারী যুবক অভিনিবেশসহকারে "কলঙ্ক-ভঞ্জন" গাথা শ্রবণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ জনৈক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ ব্যক্তি কোথা হইতে আগমন-পূর্ব্বক যুবকটীকে বহু ভৎ‍র্সনা করিলেন এবং সংসারধর্ম্মে পূর্ণভাবে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিয়া বায়ুসেবনের জন্য জাহ্নবী-তট বাহিয়া কেদারাভিমুখে ঘৃণাভরে প্রস্থান করিলেন। যুবক সর্ব্বক্ষণই গম্ভীর মুখে নৃত্যশীল গঙ্গাবক্ষে চাহিয়াছিলেন, তীব্র ভৎ‍র্সনার কোন উত্তরই প্রদান করিলেন না। আগন্তুক চলিয়া যাইলে তিনি পুনরায় হাসিমুখে কলঙ্ক-ভঞ্জন শুনিতে লাগিলেন। এই ঘটনা-প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। একদিন আমি তাঁহার সুখ দুঃখের কথা শ্রবণের জন্য ঔৎসুক্য

প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, "আসুন, এই 'অসি সঙ্গমে' বসিয়া গঙ্গাবক্ষে ঈশ্বরের লীলা দেখি। সে সকল কথা আর একদিন বলিব।" তাহার পর অনেক দিন একত্র অতিবাহিত হয়। কিন্তু আমিও কোনদিন সে কথার পুনরুল্লেখ করি নাই, তিনিও কোন দিন যাহা বলিবেন বলিয়াছিলেন তাহা বলেন নাই। আমি যে দিন কাশীধাম হইতে বিদায় লইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি সেই দিন শেষমুহূর্ত্তে তিনি আমাকে যাহা দিয়াছিলেন নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। হয়ত আমারই ন্যায় অপর কোন নাগরিক উহা পাঠে আমারই ন্যায় আনন্দ পাইতে পারেন এই জন্য সেই কাহিনী প্রকাশের এই প্রয়াস।

"সেদিন একজন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বহুদিনের আলাপ। এত দিনের আলাপ যে কোন সময় যে প্রথম পরিচয় হয় অদ্য তাহা চেষ্টা করিয়াও মনে করিতে পারিতেছি না। তাঁহার বয়স আমার বয়সের অপেক্ষা কয়েক বৎসর অধিক। তিনি চিরদিনই সুন্দর পুরুষ। তাঁহার সৌন্দর্য্য এই প্রৌঢ়েও অক্ষত,—আজিও রূপের নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ। অনেক দিন পরে দেখা হইল। অনেক ভৎর্সনা করিলেন। তাঁহার একটি

কথাও প্রাণের মাঝে ঝঙ্কার তুলিতে পারিল না। গঙ্গার কাল জলের সহিত সে তালে তালে নাচিতেছিল। শুনিতে হইল তাই শুনিলাম। ভৎর্সনা-শেষে তিনি-জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার চেহারা এত মলিন হইয়া গিয়াছে কেন?" কলের মত আমার মুখ হইতে নির্গত হইল, "আপনার চেহারা ত' তেমনই সুন্দর রহিয়াছে।" তাহার পর আত্মীয়-জন চলিয়া গেলেন। এই উপলক্ষে আপনার সহিত আমার পরিচয় হয়। একদিন সন্ধ্যার সময় অসি-সঙ্গমে বসিয়া আপনি আমার সুখ দুঃখের কথা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। আমার ঐ আত্মীয়ের শেষ কথার সহিত আমার জীবনের প্রধান সুখ ও প্রধান দুঃখের ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে। তাই আত্মীয়ের শেষ কথার আলোচনা করিতেছি। এই আলোচনা হইতে সেই সন্ধ্যায় আপনি যাহা শুনিতে চাহিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিবেন।

আমার সৌন্দর্য্য-হ্রাসের কারণ আমার দুঃখ। তাঁহার সৌন্দর্য্য-স্থিতির কারণ তাঁহার সুখ। তিনি অশিক্ষিত। শিক্ষা মানব হৃদয়ে কর্ত্তব্য ও আদর্শ সম্বন্ধে যে ঘোরতর সংগ্রাম বাধাইয়া দেয়, তাঁহার হৃদয় সেই যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হয় নাই। তিনি পল্লীগ্রামে চিকিৎসা ব্যবসায় করেন।

পিতৃধনে এবং স্বোপার্জ্জিত সামান্য অর্থে তাঁহার বেশ চলিয়া যায়। তিনি সামাজিক লোক। প্রয়োজনমত প্রতিবেশীর সহিত বিশেষ প্রকর ঝগড়া বিবাদ করেন, আদালতে নালিশ মোকদ্দমা করেন। দরকার হইলে সত্যের অপলাপ করিতে পারেন। আবার প্রয়োজন হইলে স্বহস্ত-রোপিত বেল-ফুলের গাছ হইতে বড় বড় ধবধবে ফুল তুলিয়া অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া লোকের চরণে দিয়া সামাজিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির জন্য অপরকে বেশ ধরিতে পারেন। যতক্ষণ তাহার দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার আশা থাকে ততক্ষণ তাহার বেশ মন রাখিতে পারেন। যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির ইচ্ছা থাকে আর যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেই বিষয়ে মত না থাকে এমন বুঝেন—তাহা হইলে তিনি অনায়াসে কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠের মত বিরুদ্ধে কাজ করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। সকল চেষ্টা করিয়াও যদি কনিষ্ঠের দ্বারা স্বকার্য্যোদ্ধার না হয় তখন কনিষ্ঠ কোনও কালে যে উন্নতি করিতে পারিবে না ইহা অসঙ্কোচে সকলকে বলিয়া বেড়াইতে থাকেন। এইরূপে ও অন্যরূপে তিনি অনেকের প্রিয়। আর একটী কথা—তিনি শিক্ষিতসম্প্রদায়ের উপর "হাড়ে চটা"।

কারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় কোন কাজ ভবিষ্যতে করিবে বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা চেষ্টা করিবে এই মাত্র বলে; তিনি করিবেন বলিয়া স্বীকার করেন—তাহার পর করুন আর নাই করুন।

আর আমি? পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। দেখুন, আপন মুখে আপন কথা বলিতে যাওয়ার অনেক দোষ—অনেক সময় তাহাতে অহঙ্কারের ভাব অনেকে সন্দেহ করেন। আপনার সহিত এই কয়েক দিনের পরিচয়ে আমার ধারণা হইয়াছে যে, আপনি এই আলোচনা পড়িয়া সেরূপ মনে করিবেন না। তাই অকপটে যাহা সে দিন আপনি শুনিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তেমনই অকপটে আজ আমি আপনাকে বলিতেছি। ইহার মধ্যে কোন অহঙ্কার বা অভিমান নাই। আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। কাজ কর্ম্মের জন্য সহরে যাই। কাজকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে বহুদূরে চলিয়া যাই। পিতৃধন নাই। স্বোপার্জ্জিত অর্থও অতি সামান্য। যাহাকে সাধারণ কথায় বঙ্গদেশে আজকাল "সামাজিক লোক" বলে আমি তাহা নহি। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে অর্থ আবশ্যক সেই অর্থ উপার্জ্জনের জন্য যেস্থানে যাওয়া দরকার সেই স্থানে যাইয়া

নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে ফিরি। বাকি সময় আপন কক্ষে একাকীই বাস করি। প্রতিবেশীর সহিত প্রীতির বন্ধন স্থাপিত করিবার ইচ্ছা ছিল এবং এখনও আছে কিন্তু সে প্রীতি-স্থাপনের সুযোগ হয় নাই,—কারণ, পর-নিন্দা, পর-চর্চ্চা করিয়া সময় কাটাইতে চেষ্টা করিলে আমার মন খারাপ হয়। দরকার হইলে মনোরঞ্জন করিতে পারি না বা কলহ করিতে পারি না,—কারণ উভয়েতেই আমার অসুখ করে। আদালতে কখনও যাই নাই। সত্য গোপন করিয়া অসত্যের সেবা করিতে পারি না। প্রফুল্ল প্রসূন চয়ন করিয়া গৃহ-দেবতা নারায়ণের পূজা করিতে পারি, মানবের চরণে অঞ্জলি দিতে পারি না। কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠের মতবিরুদ্ধে চলিবার জন্য উত্তেজিত করিতে পারি না। কেহ যদি বলেন যে কোন কার্য্য করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিবেন বটে তবে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারেন না, কারণ ঐ স্থলে যদি ঐ কার্য্য করিতে না পারেন তবে তাঁহার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হইবে, তাহা হইলে আমি তাঁহার প্রতি "হাড়ে চটি" না।

এই ত আমাদের অবস্থা। তবে তাঁহার এত সুখ কেন, আর আমারই বা এত দুঃখ কেন? তাঁহার যৌবনই বা

আমার দুঃখ।

আজ পূর্ণ কেন, আর আমিই বা আজ বৃদ্ধ কেন? অনেক দিনের একটি কথা আজ মনে উঠিতেছে। আমরা দুইজন ভারতবাসী আর তাঁহারা দুইজন শ্বেতদ্বীপবাসী। সম্মুখে প্রকৃতির লীলাভূমি,—বন-বিভূষিত পার্ব্বত্য প্রদেশ। অদূরেই কল-হাসিনী, মৃদুগামিনী শৈলজা মন্থরগতিতে প্রবহমাণা—পর্ব্বতের পাদদেশে সবুজ-তৃণ-সুশোভিত মনোহর ক্ষেত্র। মধ্যস্থলে সাধু সেণ্ট জনের মন্দির। শান্তিনিকেতন! মন্দির-শীর্ষে খৃষ্টের হৃদয়-বিদারক বধ-চিহ্ন ক্রশ—ত্যাগের, আত্মবলির, মানবের নিমিত্ত ঈশ্বরের বেদনার চিরোজ্জ্বল চিহ্ন—শোভা পাইতেছে। উন্মুক্ত দ্বারপথে ধীরে ধীরে সুসজ্জিত নরনারী মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। তালে তালে, মধুরে, গম্ভীরে, মন্দিরের ঘণ্টা বাজিতেছে ও সকলকে সান্ধ্য উপাসনায় আহ্বান করিতেছে। বসন্তের শান্ত সন্ধ্যানিল মৃদু মন্দ বহিয়া পার্ব্বত্য কুসুমের সৌরভ ছড়াইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। আমরা চারিজন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া প্রীতি-সম্ভাষণে নিরত ছিলাম। মন্দিরের সন্ন্যাসী মন্দির-প্রবেশ-পথে দণ্ডায়মান হইয়া গাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণ হাস্যমুখে মন্দিরগামী ব্যক্তিগণকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছিলেন। আমাদের এক ইংরাজ বন্ধু পাদরীর মুখের দিকে চাহিয়া আমাদের দিকে ফিরিয়া

বিস্ময়ভরে বলিলেন "দেখুন, বড়ই বিস্ময়ের বিষয়! এই পাদরী আমার অপেক্ষা বয়সে ছোট। ইহার কোনও ভাবনা চিন্তা নাই। গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা নাই। সংসারের কোন কলরবই ইহার কর্ণে প্রবেশ করে না। স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই। কোনই ভাবনা নাই। তবুও এত অল্প বয়সে এত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। আর আমি?—শত-জ্বালা-যাতনাময় সংসারের জীব আমি? আমার মুখে হাসি ব্যতীত নাই,—আমার সুস্থ, সবল দেহ, আমার অনন্ত আমোদ। বড়ই বিস্ময়ের বিষয়!!" বন্ধুর কথা শুনিয়া সেদিন মনে করিয়াছিলাম,—যাউক, সেদিন কি মনে করিয়াছিলাম আজ আর তাহা এস্থলে বলিয়া কাজ নাই। আজ দেখিতেছি আমার জীবনেও সেই অবস্থা। আমার আত্মীয়ের শরীর সুস্থ, মনে সুখ, অধরে হাসি। আমার শরীর শীর্ণ, মনে বিষাদ, অধরে বেদনা। কেন এমন হইল?

তিনি সুখী। কারণ, তিনি যাহা চাহিয়াছেন তাহা পাইয়াছেন, যাহা আজিও পান নাই তাহা পাইবেন আশা আছে। আমি দুঃখী। কারণ, আমি যাহা চাহি তাহা পাই নাই, কখনও পাইব কি না তাহাও আমার জ্ঞানের অতীত। তিনি সুখী। কারণ, তিনি যাহার সাধনা করিয়াছেন

তিনি তাহা পাইয়াছেন। আমি দুঃখী। কারণ, আমি যাঁহাকে লাভ করিবার অভিলাষী তাঁহাকে প্রসন্ন করা ত দূরের কথা, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যে আরাধনা করা আবশ্যক আমি আজিও সে আরাধনাও করিতে পারি নাই। তিনি চাহেন ধন, রত্ন, প্রভুত্ব। আমি চাহি ধনের ধন, রত্নের রত্ন, দাসত্ব। তাঁহার প্রভুত্ব মিলিয়াছে। আমার দাসত্ব মিলে নাই। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে প্রার্থিত বস্তু মিলিতে পারিবে মনে করেন, তিনি সেই সকল উপায় অবহেলায় অবলম্বন করিয়াছেন,—সদসদ্ বিবেচনা করেন নাই। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে প্রার্থিত বস্তু লাভ করিতে পারা যায়, শত চেষ্টা করিয়াও আমি সে সকল উপায় অবলম্বন করিতে পারি নাই। তিনি তাঁহার প্রাণের প্রাণ পাইয়াছেন; আমি আমার প্রাণের প্রাণ পাই নাই। তাই তিনি সজীব, আমি নির্জীব। তিনি বর্ত্তমান সমাজের সহিত বেশ সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছেন; আমি তাহা একটুও করিতে পারি নাই। যে কাজ তিনি হাসিতে হাসিতে করিতে পারেন, সে কাজের গল্প শুনিলে আমার শরীর উষ্ণ হয়, মুখে দুর্গন্ধ ছুটে, সে কাজ করিলে আমাকে শয্যাশায়ী হইতে হয়। তিনি স্রোতের অনুকূল যাইতেছেন, আমি গড্ডালিকা-প্রবাহে

আপনাকে ভাসাইতে পারি নাই। তাঁহার সাধের তরণী রঙ্গে চলিয়া যাইতেছে। আর যাঁহাকে কাণ্ডারী করিয়া আমি আমার তরণী অকূল সাগরে ভাসাইলাম "সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে"! তাই তিনি সুখী। তাই আমি দুঃখী।

আমার দুঃখ দেখিয়া অনেকে সহানুভূতি করেন। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী জনৈক পণ্ডিত হিতৈষী আমার কষ্ট দেখিয়া আমাকে অনেক বুঝাইয়া থাকেন। বলিয়া থাকেন "ঈশ্বর এই পৃথিবীতেই; দৈনন্দিন সাংসারিক কর্ম্ম করাই তাঁহার আরাধনা। শুধুই ধ্যান ধারণা লইয়া থাকিলেই এত কষ্ট হইবেই হইবে। ফিরিয়া আইস, লোকহিতকর কার্য্য কর, শান্তি মিলিবে।" প্রাণ কিন্তু আমার সেই মানা মানে না। সে বলে—"যাহারা ত্যাগ করিতে অক্ষম, যাহারা সংসারের মান যশঃ ভালবাসে তাহারাই বলে সংসারের কর্ম্ম করাই উপাসনা; যাহারা এত বহির্ম্মুখ যে দুই দণ্ড স্থির হইয়া উপাসনা করিতে পারে না তাহারাই বলে যে শুধু ধ্যান ধারণায় ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। যাহারা এইরূপ লোকহিতকর কার্য্যের কথা বলে তাহারা বুঝে না যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্কর, খৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্য যে জগতে স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই সে জগতে শান্তির

ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস করা সামান্য মানবের পক্ষে কেবল আত্ম-প্রতারণা, কেবল স্বার্থসিদ্ধির ছদ্মবেশ। কোন কোন হিন্দু বন্ধু বলেন “ভাই, চেষ্টা ত করিলে অনেক। কিন্তু সাধনার ভূমিতে ত স্থির হইতে পারিলে না, যাতনা ত দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, তবে একটু নামিয়া আইস। এক জন্মে কি আর হয়? সংসারের সহিত অল্প বিস্তর সামঞ্জস্য কর, শান্তি পাইবে। তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার বুক ফাটে।” আমি কেবল অধোবদন হইয়া থাকি,—কারণ, উত্তর করিতে ইচ্ছা হয় না। চাতক দারুণ বজ্রাঘাত বক্ষে ধারণ করে তবুও সে মেঘের আশা ত্যাগ করে না। যদি কখনও মুখ ফুটিয়া কথা বলি তবে একটি গল্প বলিয়া থাকি। এক ভদ্রলোকের গৃহে কিছুদিন অবস্থিতি করিতে বুঝিলাম যে গৃহস্বামী সুরাগতপ্রাণ। উপার্জ্জিত অর্থ ত উড়িয়া যায়। অনেক সময় পত্নীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া আসব সেবন করিয়া থাকেন। একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার স্ত্রী একখানি ছোট মলিন বসন দ্বারা কোন ক্রমে লজ্জা নিবারণ করিয়া আমি যে কক্ষে বসিয়া লেখা পড়া করিতে ছিলাম সেই কক্ষে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রোদন করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। অল্পপরিসর,

নির্ম্মাল্য।

মলিন বসন দেখাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন "আমার মরণ হইলে বাঁচি। ঘরে কাপড় গোছাইয়া রাখিয়া গা ধুইতে গিয়াছিলাম। উনি ঘরে বসিয়াছিলেন। কাপড় কাচিয়া আসিয়া দেখি ঘরে কাপড়ও নাই মানুষও নাই।" এই বলিয়া রমণী দুঃখভরে কাঁদিতে লাগিলেন। বুঝিলাম আসবের দাস স্বামী স্বীয় পত্নীর অনুপস্থিতে তাঁহার এক-মাত্র পরিধেয় বসন খানি অপহরণ করিয়া সুরাপিপাসা নিবারণ করিবার জন্য শৌণ্ডিকালয়ে গমন করিয়াছেন। বিশেষ আঘাত পাইলাম। অসহায়া রমণীর কষ্ট দেখিয়া মনে করিলাম তাঁহার স্বামীর মন্দ অভ্যাস দূর করাইবার চেষ্টা করিব। বন্ধু বান্ধব সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। সহজ অবস্থায় প্রায় পাওয়া যায় না। একদিন একটু প্রকৃতিস্থ দেখিয়া তাঁহাকে সে দিনের বস্ত্রহরণের ব্যাপার বুঝাইয়া দেওয়া হইল। মদ্য তাঁহার চেতনা কতদূর অপহৃত করিয়াছে তাহা বুঝিলেন। বেদনা পাইলেন। অনেক কাঁদিলেন। আমাদের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। পত্নীকে আদর করিলেন। আমরা সর্ব্বদা তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে লাগিলাম। কিছুদিন বেশ গেল। একদিন সন্ধ্যার পর দেখি তাঁহার স্ত্রী বসিয়া কাঁদিতে-ছেন। তাঁহার কর্ণ হইতে রক্ত ঝরিতেছে। হতভাগ্য স্বামী

আমার দুঃখ।

পত্নীর কাণ ছিঁড়িয়া কর্ণাভরণ লইয়া আসবালয়ে গমন করিয়াছেন। অনেক রাত্রিতে চারি পাঁচ জন লোক ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাড়ী রাখিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে জ্ঞান হইলে সকলে তাঁহাকে অনুযোগ করিতে আরম্ভ করিলে তিনি বলিলেন "ভাই, অনুযোগ আর বৃথা। রাবণ রাজা কি আর জানিত না যে রামের সীতা হরণ করিলে সবংশে নিহত হইতে হইবে, তবুও কি সে সেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল? আমিও জানি মদে আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে তবুও আমি উহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কেন, জান? নিয়তি,—আমার নিয়তি ঐ।" আমার অবস্থা দেখিয়া সমবেদনা জানাইলে আমি বন্ধু বান্ধবের নিকট ঐ গল্পটী করি আর বলি "এই আমার নিয়তি।" তোমরা দুঃখ করিও না। আমাকে ফিরাইবার প্রয়াস করিও না। এজন্ম আমার দুঃখের,—তোমরা সুখের ব্যবস্থা করিলেও আমার সুখ হইবে না। এবার দুঃখ আমার নিয়তি,—সুখের বস্তু সমুদয় থাকিতেও আমার দুঃখ নিবারণ হইবার নহে। নিশা-সমীরণ-শীতল, কুসুম-সৌরভ-সুরভিত, রম্য পাদপপত্র-পুষ্পালয় পরিত্যাগ করিয়া পতঙ্গ যেমন কক্ষাভ্যন্তরস্থ তীব্রোজ্জ্বল আলোকের প্রতি ধাবমান হয়, আমিও সেইরূপ

ঐ রূপবহ্নির প্রতি ধাবমান হইয়াছি। ভাই, সুখের পরিবর্ত্তে তীব্র-দাহন-নিপীড়িত হইয়াও পতঙ্গ যেমন প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না, আমিও সেইরূপ শত দুঃখেও প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। বন্ধু! কক্ষাভ্যন্তরস্থ তীব্রোজ্জ্বল আলোক যেমন পতঙ্গের নিয়তি, ঐ নীলনভোমণ্ডলের তারকারাজির অভ্যন্তরস্থ সৌন্দর্য্যই তেমনই আমার নিয়তি। হয় ঐ নীল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া ঐ সৌন্দর্য্য বক্ষে ধারণ করিব, নহে ত ঐ রূপবহ্নিতেই দগ্ধ হইয়া মরিব। এই আমার নিয়তি, ভাই, এই আমার নিয়তি। তুমি আমার দুঃখে কাঁদিওনা। যাও, তুমি সমাজে প্রবেশ করিয়া তোমার সুখের সন্ধান কর। আমি যাই, দেখি ঐ তারকারাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি কি না। কি মধুরোজ্জ্বল আলোক! কি নয়নাভিরাম ছবি!!

"না জানি আপন প্রাণে
কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি।
আমি ত প্রাণ নেব না, প্রাণ দেব না,
আপন প্রাণে ভালবাসি।
তারা তুলে পরব চুলে,
করব চুরি চাঁদের হাসি!!!"

আষাঢ়ের এক প্রভাতে।

ক্ষিপ্র-সঞ্চরমাণ-মেঘমালা-পরিশোভিত, জ্যোতির্ম্ময়-বিজলী-বিজড়িত, গুরুগম্ভীর-ইরম্মদ-ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত বর্ষাকাল আমি ভালবাসি। চিরদিনই বাসি;—যখন বালক ছিলাম তখনও ভালবাসিতাম, এখন যে এই বৃদ্ধ হইয়াছি এখনও বাসি। তবে তখন, সেই জীবন-প্রভাতে ভালবাসিতাম এক ভাবে, আর এখন এই জীবন সন্ধ্যায় বাসি আর এক ভাবে। এই যে জীবনব্যাপিনী বর্ষাপ্রীতির কথা বলিতেছি, ইহা আজ এই বার্দ্ধক্যে আষাঢ় মাসের দ্বিপ্রহরে বর্ষার ধারার মাঝে বসিয়া যখন জীবনের কথা ভাবিতেছি তখন মনে আসিতেছে; বাল্যকালে কোনও দিন মুহূর্ত্তের তরেও মনে উঠে নাই যে বর্ষা ভালবাসি,—ভালবাসি কি ভালবাসি না তখন এই সমালোচনা জাগিত না, তখন শুধুই ভোগ করিয়া যাইতাম। তখন যখন বর্ষা নামিত—ধূম্রবর্ণ জলদজাল গগনমণ্ডল আবৃত করিত, চতুর্দ্দিক শান্ত, স্থির, গম্ভীর ভাব ধারণ করিত, অস্ফুট ধূসর বর্ণে ধরণী আবৃত হইত, পবনপথে জলদে জলদে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিত, গভীর

মন্দ্রে বজ্র গর্জ্জিত, সন্ত্রস্তা সৌদামিনী চকিতা হরিণীর ন্যায় কৃষ্ণ মেঘ হইতে মেঘান্তরে স্বীয় বরবপু লুকাইত,—তখন অত্যন্ত ভাল লাগিত, প্রাণে অসীম আনন্দ হইত, কেমন উল্লাসের উচ্ছ্বাসে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিত। প্রাঙ্গণ-পার্শ্বস্থ, পতিত-প্রাচীর পাঠশালার ভগ্ন কাষ্ঠাসনের যে অংশটুকু গলিত পর্ণাচ্ছাদন হইতে পতিত বৃষ্টিজলে একেবারে ভাসিয়া না যাইত সেই অংশটুকুতে ক্ষুদ্র, মলিন, ছিন্ন, বৃষ্টিজলসিক্ত বস্ত্রখানি পরিয়া অনাবৃত দেহে উপবেশন করিয়া পাদুকা-হীন ধূলিধূসর চরণ দোলাইতাম আর এই বৃষ্টির খেলা দেখিতাম। আগুনের মালসায় কাঁঠালের আঁঠি অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া তৃপ্তির সহিত খাইতাম, পার্শ্বে আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, যাদববাবুর পাটীগণিত, পি, ঘোষের শুভঙ্করী পড়িয়া থাকিত। যদি কোন প্রকারে সতর্ক-প্রহরী পিতৃব্যের স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারিতাম তাহা হইলে বিবিধগুণোপেত পিতৃব্য-পরিচালিত পাঠশালা হইতে একলম্ফে পুষ্পোদ্যানে পড়িতাম, এবং কুটজ-কুসুমতরুতলস্থ স্রোতপথ বাহিয়া কলকলস্বরে যে বর্ষাবারি ঠাকুরদাদামহা-শয়দের পুষ্করিণীতে পতিত হইত সেই জলধারা ধরিয়া যে নববর্ষাপ্রফুল্ল সফরী ভাসিত তাহা কতই আনন্দে ধরিতাম। এখনও, এইবৃদ্ধ বয়সেও বর্ষাকাল বড়ই আনন্দ দান করে।

আষাঢ়ের এক প্রভাতে।

যখন দিগন্তব্যাপী কৃষ্ণমেঘ গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করে, যখন সমস্যাপূর্ণ নিস্তব্ধতা চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া দাঁড়ায়, যখন দিগ্বিশেষ হইতে আগতপ্রায়, অদূরস্থ বৃষ্টি-পতন-শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, যখন দূরবর্ত্তী হিমালয়-শৃঙ্গ প্রাবৃট্-শোভায় শোভিত হয়, যখন চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষাবলী বৃষ্টির আবরণে কৃষ্ণ স্তূপ বলিয়া প্রতীত হয়, যখন বিশাল প্রান্তরে বৃষ্টি-ধারায় শূন্যে পাংশুবর্ণ স্তর রচিত হয়, তখন যখন বস্ত্রাবৃত হইয়া আতপত্রের আশ্রয়ে প্রান্তর-মাঝে আসিয়া দণ্ডায়মান হই, তখন অত্যন্ত আনন্দ হয়। গভীর-কৃষ্ণ-মেঘাবৃত অসীম-গগনতলে দণ্ডায়মান হইয়া, সমস্যাময়-নিস্তব্ধতা-পরিবৃত হইয়া, কৃষ্ণস্তূপপ্রতীয়মান হিমগিরি ও শূন্য-প্রতিষ্ঠিত, বারিধারারচিত, ধূসর ছায়া অবলোকন করিতে করিতে বোধ হয় যেন এক অভিনব রাজ্যে উপনীত হইয়াছি—কে এক মহাপুরুষ যেন অসীম গগনরূপে ভাসিতেছেন, কে এক মহাপুরুষ যেন কৃষ্ণ জলদাকার ধারণ করিয়া বিস্তৃত গগনতলে ভাসিতেছেন, কে এক মহাপুরুষ যেন কৃষ্ণস্তূপ হিমালয় হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, কে এক মহাপুরুষ যেন বারিরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইতেছেন, কে এক মহাপুরুষ যেন নিস্তব্ধতা-রূপে আমার চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছেন। আমার ঊর্দ্ধে,

অধে, সম্মুখে, পশ্চাতে কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—তিনি যেন আমার অঙ্গে অঙ্গ দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আমি যেন তাঁহার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছি—এ রাজ্যে অখণ্ড সুখ, অসীম শান্তি! বর্ষার এ সুখ ছাড়িতে প্রাণ চাহে না, এ মহালিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে না—আরও গভীররূপে আলিঙ্গিত হওয়ার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। এক কথায় আবাল্য আমার এই প্রাবৃট্-প্রীতি।

বর্ষপরে আমার চিরপ্রিয় বর্ষা আসিয়াছে। আষাঢ় মাস। গত রজনী দুই প্রহরের পর হইতে বৃষ্টি নামিয়াছে। সারারাত্রি প্রবলভাবে বর্ষিয়াছে। এই প্রভাতে বর্ষণবেগ একটু প্রশমিত হইয়াছে, বাতায়ন-পথে নিসর্গের প্রাবৃট্-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করা যাইতেছে। বর্ষার শোভা এই স্থানে বড় একটা ফুটে না। এ সেই তরুলতাবেষ্টিত স্বভাব-সুষমাময় শৈশবের প্রিয় পল্লীকুটীর নহে,—বর্ষা-বারিবিধৌত, সবুজ-পত্রশোভিত, সজীব তরুলতা এখানে নয়নাভিরাম দৃশ্য রচনা করে না, এখানে নববারিসঞ্জীবিত, শ্যামল তৃণরাজি গৃহপ্রাঙ্গনে চারু আস্তরণ বিস্তৃত করে না, দিগন্তবিস্তৃত, বর্ষাবারিবর্দ্ধিত, শ্যামশষ্পক্ষেত্র এখানে মানব হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে না। এ সেই লীলাময়ী প্রকৃতির রম্যভূমি মহান্ হিমালয়ের দেশ নহে,—হিমালয়ের

আষাঢ়ের এক প্রভাতে।

সেই অনির্ব্বচনীয় বর্ষাসৌন্দর্য্য এখানে মিলে না, এখানে রঙ্গময়ী পার্ব্বত্য-প্রবাহিণী বর্ষার সুশীতল বারিরাশি বক্ষে ধরিয়া নবযৌবনগর্ব্বে স্ফীত হইয়া বিলাসভরে নৃত্য করিতে করিতে চিত্তের আনন্দবিধান করে না। এখানে অসীম গগনে নবজলদোদয়ে স্রষ্টার চারু-রচনা কলাপী তাহার বিচিত্র পুচ্ছ বিস্তৃত করিয়া আনন্দপূর্ণ কেকারবে হিমগিরিকন্দরবিহারিণী, রহস্যময়ী প্রতিধ্বনিরাণীকে জাগরিত করে না। এ কলিকাতা নগরীর বাঙ্গালীটোলা, এখানে তরুলতাও নাই, গিরি—প্রান্তরও নাই; এখানে শুষ্ক-নীরস-ইষ্টকনির্ম্মিত, কুৎসিত কতকগুলি অট্টালিকা অতি কুৎসিত ভাবে তাহাদের সুষমাশূন্য, কুদর্শন নগ্ন দেহ লইয়া গাদাগাদি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; সৌরভের মধ্যে পূতিগন্ধ। বর্ষার শোভা এখানে ফুটে না, তবুও যতটুকু ফুটিয়াছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া ঈপ্সিত কার্য্যে বসিলাম। প্রভাতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়াছি, স্বহস্তে গৃহমার্জ্জনা সম্পন্ন করিয়াছি, পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়াছি। আসনে আসিয়া উপবেশন করিলাম। সম্মুখে ইষ্টদেবীর নয়নমনোহর চিত্র, আর উন্মুক্তবাতায়ন-পথে পরিদৃশ্যমান জলদজাল-সমাচ্ছন্ন বর্ষাকাশ। সাধ,—প্রাবৃটের শোভা অবলম্বন করিয়া জগজ্জননীর পূজার্চ্চনা করা।

নির্ম্মাল্য।

জগদীশ্বরী সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমানা; যখন যে স্থানেই অবস্থিতি করি না কেন, তিনি আমার অন্তরে বাহিরে,—আমি দেখিতে পাই আর না পাই, তিনি সদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। তবে আজ আবার এই বর্ষাসৌন্দর্য্য আশ্রয় করিয়া তাঁহার নাম করিবার আয়োজন কেন? সত্য, সদা সর্ব্বত্র মা আমার শোভা পাইতেছেন। যিনি সাধন পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, যাঁহার চক্ষুঃ দয়াময়ী জননী কৃপা করিয়া উন্মীলিত করিয়াছেন, তিনি সদা সর্ব্বত্র জননীকে অবলোকন করিয়া ধন্য হইতেছেন। কিন্তু মাদৃশ হীনজনের পক্ষে বর্ষাশোভা আশ্রয় করিয়া পূজার চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে। তিনি ত সদা সর্ব্বত্রই আছেন, কিন্তু দেখিয়াছি এই কলিকাতা নগরীর পথে গমন করিবার সময় 'তিনি যে আমার চতুর্দ্দিকে' এই ভাব স্বতই মনে সর্ব্বদা জাগে না, অথচ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কখনও জাহ্নবী-তট-শোভিত, দুর্গপরিখাপ্রান্তস্থ, নিভৃত, শ্যাম প্রান্তরে উপস্থিত হই, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই নিভৃত, বিশাল প্রান্তর যেন প্রাণে কেমন একটু গাম্ভীর্য্য ভাসাইয়া তুলে,—এই বিভ্রমময়ী নগরীর হৃদয়হীন অর্থের খেলা ব্যতীত আর একটা কিছু আছে, এই ভাব মনে জাগাইয়া দেয়। সহর ছাড়িয়া যখন দূরে চলিয়া

আষাঢ়ের এক প্রভাতে।

যাই, পল্লীর প্রশস্ত প্রান্তরে উপস্থিত হই, তখন চতুষ্পার্শ্ব হইতে কে যেন মৃদুস্বরে কি বলে, কে যেন ডাকিতে থাকে, কে যেন আসিয়া অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দাঁড়ায়,—তাহার স্পর্শ বড় মধুর! যখন দুকূলপ্লাবিনী স্রোতস্বতীর তীরে আসিয়া একান্তে উপবেশন করি, আর স্থির চিত্তে বিপুল জলরাশির অনির্ব্বচনীয় ভাব হৃদয়ে ধারণ করিবার প্রয়াস করি, তখন ধীরে ধীরে প্রাণের মধ্যে এক বেদনা জাগিয়া উঠে—কি যেন হারাইয়াছি, এই বিপুল জলরাশি যেন তাহার সংবাদ রাখে, সে যেন জীবনের সার, তাহাকে না পাইলে জীবন যেন ব্যর্থ হইবে। যেদিন অত্যুচ্চ মহীধর-শৃঙ্গে আরোহণ করি সেদিন এক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়!—যে মনকে শত চেষ্টায় অন্তরে আনিতে পারি না, সহস্র চেষ্টায় যে মনকে স্থির করিতে পারি না, সেই সতত-চঞ্চল মন উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে উপস্থিত হইতে না হইতেই কতই শান্ত হয়। যে কামনা-বাসনার বন্ধন কিছুতেই উন্মোচন করিতে পারি না, শিখরিশেখরে সুখাসনে সরল হইয়া বসিতে না বসিতেই সেই কামনা-বাসনার বন্ধন স্বতই উন্মুক্ত হইয়া যায়। শত চেষ্টাতেও যে ব্যাকুলতা হৃদয়ে জাগাইতে পারি না, মুহূর্ত্তে সেই ব্যাকুলতা প্রাণে জাগিয়া উঠে, সংসারের সকল বস্তুই অসার

বলিয়া বোধ হয়, সারাংসারের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। অত্যল্পকাল ধ্যান করিতে না করিতেই বোধ হয় যেন ঈশ্বরে ডুবিয়া আছি,—আমি আর তিনি যেন এক হইয়া গিয়াছি, প্রতি নিঃশ্বাসে তিনি যেন আমার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন, প্রতি প্রশ্বাসে তিনিই যেন হৃদয়-অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া বায়ুসাগরে মিশিয়া যাইতে-ছেন, তিনিই যেন ধমনীতে ধমনীতে শোণিতরূপে খেলা করিতেছেন, প্রতি লোমে তিনিই যেন দাঁড়াইয়া আছেন। এইরূপে দেখিতে পাই যখনই প্রকৃতির কোন বিরাট্ বস্তুর সমীপে উপস্থিত হই তখনই প্রাণের প্রাণকে সহজেই প্রাণের মাঝে উপলব্ধি করিতে পারি। তাই বোধ হয়, তিনি সদা সর্ব্বত্র বিরাজমান হইলেও আমার তুল্য লোকের পক্ষে প্রকৃতির কোন বিরাট্ বস্তুর সান্নিধ্যে উপাসনারত হওয়া ভাল। এই ত হইতেছে প্রকৃতির বিরাট বস্তুর কথা। আবার প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-বিশেষও সহায় করিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলে সত্বর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। অমানিশার দ্বিপ্রহরে যখন ধরণী অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হয়, অতি নিকটস্থ বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই সময় গৃহচ্ছাদে বসিয়া অগণিত-তারকা-খচিত নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া উপাসনার চেষ্টা করিলে

বিশেষ উপকার হয়। তখন বোধ হয় এই নিবিড় অন্ধকার অন্ধকার নহে, কে যেন এই বিরাট অন্ধকাররূপে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান আছে। তাহার অঙ্গে আমার অঙ্গ মিশিতেছে, তিনি যেন আমার দেহের প্রত্যেক স্থান দিয়া আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন, আমাকে যেন তিনি তাঁহার দেহে মিশাইয়া না লইয়া ছাড়িবেন না। আকাশের অসংখ্য তারকা যেন আমাদের এই মিলন অনিমেষে দেখিতেছে। যে ঈশ্বর-সান্নিধ্য বহু চেষ্টায়ও অন্য সময় অনুভব করিতে পারি না এই অমানিশার অনুগ্রহে কত সহজেই সেই সুখের সান্নিধ্য অনুভব করিয়া শান্তির সাগরে ডুবিয়া যাই। পূর্ণিমা রজনীতে নিখিল বিশ্ব যখন জ্যোৎস্না মাখিয়া নীরবে ঘুমাইয়া পড়ে তখন উন্মুক্ত প্রান্তরে অনাবৃত দেহে দাঁড়াইলেই পবিত্র জ্যোৎস্না-প্রবাহে দেহ মন পবিত্র হয়, বোধ হয় যেন জ্যোৎস্নারূপে জননী আসিয়া তাঁহার স্নেহের সন্তানকে স্নেহপরিপূর্ণ বক্ষে গ্রহণ করিতেছেন! হৃদয় তখন এই শান্তরসে মগ্ন হইয়া এক অননুভূত সুখের হিল্লোলে ভাসিতে থাকে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যবিশেষ অবলম্বন করিয়া উপাসনার চেষ্টা করিলে সহজেই আনন্দের আস্বাদ পাই বলিয়া আজ এই আষাঢ়ের প্রভাতে বর্ষা-সৌন্দর্য্য আশ্রয় করিয়া

নির্ম্মাল্য।

জগজ্জননীর চরণ-কমলে স্থির হইবার প্রয়াস করিতেছি।

সুখাসনে সরলভাবে আমি উপবিষ্ট। সম্মুখে ইষ্টদেবীর রমণীয় চিত্র, আর বাতায়ন-পথে প্রাবৃট্-শোভা। ফোঁটার পর ফোঁটা, ফোঁটার পর ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। যেন শত সহস্র বক্রবারিধারা শূন্যমার্গে অবিরত ধরামুখে ছুটিয়াছে। বৃষ্টি-পতন-বশতঃ চতুর্দ্দিকে একটু অস্ফুট অথচ স্ফুট, একটু ক্ষীণ অথচ বোধগম্য শব্দ উত্থিত হইতেছে। শব্দটি যে কেবল আমার কক্ষ বেষ্টন করিয়া আছে এরূপ বোধ হইতেছে না,—সে যেন কতদূর হইতে আসিয়া কতদূর ব্যাপিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বহুক্ষণ রাত্রি প্রভাত হইলেও জনসঙ্ঘশব্দময়ী কলিকাতানগরী এখনও জাগরিত হয় নাই, প্রভাতের এই মিষ্ট বর্ষার সময় সে তাহার সুখশয্যায় শয়ন করিয়া একটু আরাম ভোগ করিতেছে। বৃষ্টির জন্য পথ দিয়া গাড়ী ঘোড়াও বড় যাইতেছে না। ফেরিওয়ালাও তাহার অর্থহীন, সাঙ্কেতিক বিকটরবে মনকে চঞ্চল করিতেছে না। শুধু ভাবজনক বারিপতন-শব্দই শ্রুত হইতেছে। পতনশীল বর্ষাবারি শূন্যে এক পাংশুবর্ণ ছায়া রচিত করিয়াছে, শূন্যস্থিত অন্তঃসারহীন এই ধূসর ছায়া কেমন একটু কল্পনা জাগাইতেছে।

আষাঢ়ের এক প্রভাতে।

কোলাহলমুখরিত, প্রেমস্পর্শহীন এই সহরে এই প্রকার শান্তভাব প্রায়ই লাভ করা যায় না। বসিয়া বসিয়া বক্রবারিধারা লক্ষ্য করিলাম। মনের নয়নে দেখিলাম, সীমাহীন পৃথিবী ব্যাপিয়া বক্র বারিধারা ধরামুখে অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে, আমার চতুষ্পার্শে শুধু বক্র বারিধারা। বারিধারা বুকে ধরিবার প্রয়াস করিলাম, ধরিতে পারিলাম না,—উহারা আমার দেহ স্পর্শ করিল না। বক্র বারিধারা আমার দেহ বক্রভাবে ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, এই ধারণা ধরিয়া আমার দেহকে বারিধারাবিদ্ধ দেখিবার যত্ন করিলাম, প্রয়াস ব্যর্থ হইল। এই বিরাট পৃথিবীর ক্ষুদ্র এক পরমাণু আমি, বারিধারা এই ক্ষুদ্র পরমাণুকে বিরাট পৃথিবীর বিশালত্বে বিলীন করিয়া দিয়াছে—এই অবস্থা প্রাণে অনুভব করিবার চেষ্টা করিলাম। যে পরমাণু সেই পরমাণুই রহিলাম, বিরাটের দেহে আমার অস্তিত্ব লুপ্ত হইল না। স্থির চিত্তে বহুক্ষণ ঐ রহস্যময় বারিপতন-শব্দ শুনিলাম। যেদিন জননী আমার প্রভাত সুপ্রভাত করেন সেদিন এই বর্ষাবারিশব্দ আমার কর্ণে এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুমধুর লহর ভাসাইয়া আনে, আমার হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল তুলিয়া দেয়। আজ ত তাহা হইতেছে না। এ' কি এ'? এ' যে

এক অস্ফুট বেদনা সমগ্র হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে! আমার শত চেষ্টা ব্যর্থ হইল,—শুধু এক গভীর বেদনা মর্ম্মে গুমরাইতে লাগিল। কিসের এ বেদনা বুঝিলাম না। শূন্যরচিত পাংশুচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলাম; ঐ রঙে সেই অবর্ণনীয় রঙ ধরিয়া আনিল না। এক গভীর কুজ্ঝটিকায় হৃদয়-গগন আবৃত হইয়া গেল। কোন সৌন্দর্য্যই ফুটিল না। প্রাণে এক দারুণ বেদনা জাগিয়া উঠিল,—হায়, আমার সাধের বর্ষা আজি বৃথা যায়। বারিধারা, বর্ষণশব্দ, ধূসরচ্ছায়া যুগপৎ হৃদয়ে ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া নয়ন মুদিলাম। হায়! হায়! ধ্যান হইল না—তন্দ্রা আসিয়া মনের নয়ন বিজড়িত করিল। প্রাবৃট্-শোভা কিছুই হৃদয়ে প্রবেশ করিল না। আজ আমার মহাদুর্দ্দিন বুঝিয়া দুর্দ্দিনহারিণী জননীর মনোহর চরণপ্রান্তে চাহিলাম,—বিঘ্নবিনাশিনীর চরণদর্শনে আমার জড়তাবিঘ্ন বিনষ্ট হইবে, এই আশা করিলাম। আশা অচিরেই নিরাশায় পরিণত হইল—যে চরণের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে করিতে আমার প্রাণ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়, আজ এই সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় চরণে চক্ষুঃ স্থির করিলাম বটে, কিন্তু মন স্থির হইল না; চক্ষু চরণে স্থির হইলেও প্রাণে চরণানুভূতি হইল না। মন চরণে বসিল না, সে বিষয়

হইতে বিষয়ান্তরে বিনা প্রয়োজনে ভ্রমণ করিতে লাগিল, আজ তাহার জগদারাধ্য চরণে রুচি হইল না। এক্ষণে প্রাণে যে বেদনা জাগিয়াছে তাহা আর কি বলিব। উন্মত্তের ন্যায় সর্ব্বশোভার আকর জননীর শান্তোজ্জ্বল, সর্ব্বসন্তাপ-বিনাশন মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম। সেই কৃষ্ণকেশরাশি তেমনই করিয়া পৃষ্ঠ আবৃত করিয়া তরঙ্গাকারে ক্রীড়া করিতেছে, সেই মণি-মাণিক্য-বিজড়িত হেম-মুকুট তেমনই ভঙ্গিভরে শিরে শোভা পাইতেছে, সেই প্রশান্ত, গৌর, অনিন্দ্য-গঠন ললাট তেমনই করিয়া শোভা ছড়াইতেছে; অনির্ব্বচনীয় ললাট মাঝে অনির্ব্বচনীয় সেই অর্দ্ধনেত্র তেমনই করিয়া আধ আলোকে আধ আঁধারে ঢলিয়া পড়িতেছে; অসীম শোভার আধার, ভঙ্গিমাময় সেই কৃষ্ণ ভ্রূ তেমনই করিয়া ললাট-নিম্নে খেলিতেছে, রঙ্গময়-অর্দ্ধ-নেত্র-নিম্নে, ভঙ্গিমাময় ভ্রূদ্বয়-মধ্যে সেই অলৌকিক সিন্দূর-বিন্দু তেমনই করিয়া ললাটের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে, আকর্ণ-বিস্তৃত, কৃষ্ণতারাসমন্বিত সেই মধুরোজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে হাসি, প্রীতি, করুণা, ক্ষমা, স্নেহ, বাৎসল্য তেমনই করিয়া লীলা-ভরে তরঙ্গ তুলিতেছে; সুগঠিত কর্ণদ্বয়ে হীরকখচিত সুবৃহৎ কুণ্ডলদ্বয় তেমনই করিয়া মনোহরণ-পূর্ব্বক দুলিতেছে, নয়নরঞ্জন,

অব্যক্ত-মাধুরী, সুদীর্ঘ নাসিকায় সেই মুক্তা-শোভিত স্বর্ণ-নথ তেমনই করিয়া মাধুরী বৃদ্ধি করিতেছে! তাম্বুল-রঞ্জিত সেই সুচারু অধর তেমনই করিয়া হাসিরাশি মাখিয়া আশার আশ্বাস দিতেছে। কি সুন্দর চিবুক! এ কি? এত শোভা দর্শন করিয়া এ কি জ্বালায় প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল? যে মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া সকল সন্তাপ বিদূরিত হয়, সকল পীড়ার উপশম হয়, মনে বিমল শান্তি আইসে, সেই শ্রীমুখ অবলোকন করিয়া আমার হৃদয়ে এ কি অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল? এ কি বিষের জ্বালায় সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছে? এ কি নিদারুণ মর্ম্মভেদী হা হুতাশ প্রাণ বিদীর্ণ করিতেছে? কেন অমৃত-সাগর এমন গরল-সিন্ধুতে পরিণত হইল? উন্মাদ আসিল না কি? যাতনায় ভাবনায় সহিষ্ণুতা বিলুপ্ত হইল, কক্ষে দ্রুত পদচারণা করিতে লাগিলাম। জ্বালা বাড়িতে লাগিল। অসহ্য শোকে হৃদয় পূর্ণ হইল। উন্মত্তের ন্যায় যেমন দ্রুত আসন ত্যাগ করিয়াছিলাম উন্মত্তের ন্যায় তেমনই দ্রুত আসিয়া আসনে পুনরায় উপবেশন করিলাম। সম্মুখে সেই মাতৃমূর্ত্তি, সম্মুখে সেই বর্ষা-শোভা। আমার মস্তিষ্কে অগ্নিকাণ্ড চলিতে লাগিল, বক্ষ মর্ম্মন্তুদ যাতনার তাড়নায় বিদীর্ণ-প্রায় হইতে লাগিল। সে যাতনার সীমা নাই। সে শোকের ভাষা নাই। জগতের

আষাঢ়ের এক প্রভাতে।

সকল সৌন্দর্য্যই যেন অন্তর্হিত হইয়াছে ; পৃথিবীর আলোক-মালা যেন মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইয়াছে ; আমার সহিত যেন জগতের কোন সম্পর্ক নাই, জগতের সকল বস্তুই যেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্তভাবে দূরে দাঁড়াইয়া আছে,—আমি যেন এক শুষ্ক প্রাণহীন স্থানে দাঁড়াইয়া আছি, জীবনে এতাদৃশ অসহায়, একাকী আর কখনও অনুভব করি নাই। অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, অসহিষ্ণুতা, জ্বালা সন্তাপ চরমসীমায় উপনীত হইল ; হতাশার অন্ধকারে হৃদয় সম্যক্‌প্রকারে আবৃত হইল। আমার যেন দেখিবার, ভাবিবার, শুনিবার, করিবার কিছুই নাই। এই মরুভূমে আমার এ যাত্রায় আগমন যেন বৃথা হইয়া গিয়াছে। আমার এ জগতের কার্য্য যেন শেষ হইয়াছে—এইরূপ ছায়াময়-ছায়াময় একটা ভাব আমাকে গ্রাস করিল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। জড়পদার্থের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। জগৎ আমার নয়ন হইতে ভাসিয়া গেল। একটি নিরাশার প্রতিমূর্ত্তি, আমি, একাকী বসিয়া আমার ব্যর্থ জীবনের সাক্ষ্যপ্রদান করিতে লাগিলাম। কি গভীর শোক! কি রহস্যময়, অনুভূতি-শক্তি-বিহীন অবস্থা!! এই বাহ্যজ্ঞান-শূন্য অবস্থায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে চক্ষু কখন আসিয়া অজ্ঞাতসারে শ্রীমুখে স্থির হইয়াছে। পূর্ব্বে যে মুখচন্দ্র

অবলোকন করিয়া হৃদয় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এক্ষণে সেই হৃদয়ই তাহার যাতনা-পীড়িত, শোকমর্দ্দিত স্পন্দনহীন অবস্থায় সেই শ্রীমুখে শান্তির আভাস পাইতে লাগিল। ক্ষণপূর্ব্বে স্থিরচিত্তে যে মুখশোভা নিরীক্ষণ করিবার শক্তি ছিল না এক্ষণে এই হতাশার সময়ে, এই জড় অবস্থায় চক্ষু সেই মুখখানির প্রতি নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিল। আমার চক্ষু যে তাহার কার্য্য করিতেছে, আমি যে স্থির হইয়া মাতৃমুখ দর্শন করিতেছি—এই অনুভূতি তখন ছিল না। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিল। হৃদয়ের ঝড় একটু কমিল। একটু চৈতন্যের অবস্থায় ফিরিয়া আসিলাম। বাহ্যবস্তুর অনুভূতি পুনরায় ঘটিল; পৃথিবী শূন্যে বিলীন হয় নাই, গৃহ দ্বার সকলই আছে বোধ হইল, বর্ষার বারিপতন-শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। আমি ত একটু পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছিলাম—আবার যেন বাঁচিয়া উঠিলাম! কিসে কি হইল? মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করিলাম, মুহূর্ত্তে মৃতদেহে প্রাণ প্রত্যাগমন করিল। মায়ের শ্রীমুখসন্দর্শন বাস্তবিকই মৃতসঞ্জীবনী সুধার কাজ করে। যখনই মৃতকল্প হইয়া আশ্রয়ের জন্য মায়ের মুখের প্রতি চাহিয়াছি তখনই আশায় প্রাণ ভরিয়াছে, পুনর্জীবন লাভ করিয়াছি। মায়ের শ্রীমুখ চাহিয়া—এবার সজ্ঞানে—পিপাসু প্রাণ গভীর আবেগে জিজ্ঞাসা করিল

আষাঢ়ের এক প্রভাতে।

"জননি ! এমন করিয়া আমাকে নির্ব্বাসিত করিতেছ কেন ? শান্ত শীতল চরণাশ্রয় হইতে এমন করিয়া হতাদরে দূরে মরুমাঝে নিক্ষেপ করিতেছ কেন ? তোমার এ পরম-সুন্দর জগতের সুষমারাশি এমন করিয়া এ অধমাধমের নয়ন হইতে তুলিয়া লইতেছ কেন ? শ্রীচরণ দর্শন করিয়া প্রাণকে সুখসাগরে নিমগ্ন হইতে দিতেছ না কেন ? শ্রীশ্রীমুখ সন্দর্শন করিয়া মনকে শান্তিসাগরে ভাসিতে দিতেছ না কেন ?" মুহূর্ত্তে মর্ম্মস্থল হইতে উত্তর উঠিল "যোগ ও ভোগ দুই চলিবে না। যে ব্যক্তি পৃথিবীর কোন বস্তুকে হৃদয়ে স্থান দিবে সে আমার চরণে স্থান পাইবে না। সর্ব্বত্যাগ করিলে সর্ব্বময়ী আমায় পাইবে। কামনা-বাসনা-কলুষিত প্রাণ আমি গ্রহণ করি না। অচির-প্রস্ফুট, পূত, শুভ্র-প্রসূনসম হৃদয়পুষ্প উপহার দিলে আমি গ্রহণ করি। যে মন্দিরে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতে চাও সেই মন্দিরে আবর্জ্জনা রাখিও না। আমি নির্ম্মল, আমার মন্দির নির্ম্মল, পবিত্র হওয়া চাই। বাসনাবিজড়িত প্রাণ আমার উপাসনা করিতে পারে না। বাসনাপূর্ণপ্রাণে লোক-দেখান আহ্নিক পূজা চলিতে পারে, কিন্তু যে উপাসনা উপাস্যকে উপাসকের নিকটে আনিয়া দেয়, যে উপাসনা উপাস্যের মধুর আস্বাদ উপাসককে ভোগ করায়, যে উপাসনা উপাসক ও উপাস্য

এই দুইকে মিশাইয়া এক করে, কামনা-বাসনা-পরিপূর্ণ হৃদয়ে সেই মুনিজনদুর্ল্লভ উপাসনা একেবারেই অসম্ভব। যদি বাসনাময় প্রাণ লইয়া আমার সমীপে আসিতে চাও তাহা হইলে জ্বালাই সার হইবে; তোমায় আমায় প্রকৃত পরিচয় হইবে না। সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা, জপ, ধারণা ও ধ্যান আমার আশ্রয়ে উপস্থিত হওয়ার সোপান। যে ব্যক্তি এই সোপানাবলী ধরিতে পারে সে ত ভাগ্যবান্, পুণ্যাত্মা। যে কামনা-বাসনা-পূর্ণ সে এই সোপানশ্রেণীর একটি স্তরেও উপস্থিত হইতে পারিবে না। কামনা, বাসনা ত্যাগ কর, —আমাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য কর,—সঙ্কল্প দৃঢ় কর, —অন্য বস্তু চাহিবে না সত্য সত্য এই প্রতিজ্ঞা কর, উপাসনায় অধিকার হইবে, শান্তি পাইবে।” অন্তরমাঝে দৃষ্টি স্থাপিত করিলাম। দেখিলাম, পরম পবিত্র দেবীমন্দিরে শত সহস্র, হেয়াতিহেয় কামনা বাসনা তাহাদের মলিন আবাস রচনা করিয়া সুখে বিহার করিতেছে। দেখিলাম, শুভেচ্ছা বাসনাদষ্ট হইয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় মৃতকল্প পড়িয়া রহিয়াছে। মানবহৃদয়ে দয়াময়ী যে শুভেচ্ছাকে স্থাপিত করিয়াছেন তাহা অমর, তাই সে এখনও বাঁচিয়া আছে; যদি করুণাময়ী তাহাকে অমর না করিতেন তাহা হইলে বাসনাবিষের তীব্র জ্বালায় এতদিন সে মরিয়া যাইত।

আষাঢ়ের এক প্রভাতে।

যখন হৃদয়মাঝে ফিরিয়া চাহিয়া বুঝিলাম যে বাসনাই আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে, বাসনাই আমাকে সুখভোগ করিতে দিতেছে না, তখন বাসনা বিদূরিত করিতে আরম্ভ করিলাম। এক একটী বাসনা এক একটি সর্পের ন্যায় তাহার দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, মসৃণ দেহলতার দ্বারা আমার হৃদয় দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া শতমুখে হলাহল ঢালিতে ছিল। এক একটি করিয়া বাসনাগুলিকে ধরিলাম। ধীরে ধীরে, একে একে তাহাদিগকে হৃদয় হইতে খুলিলাম। এক একটি করিয়া বেষ্টন যেমন উন্মুক্ত হইতে লাগিল অমনই একটু একটু করিয়া হৃদয়ে শান্তি আসিতে লাগিল। এক একটি বিষধর সর্প যেন হৃদয় জড়াইয়া তাহার বিষ ছড়াইতেছিল। এক একটি বাসনা দূর হইতে লাগিল আর এক একটি সর্পদংশন জ্বালা অপগত হইতে লাগিল। এই বাসনাবিসর্জ্জন-কার্য্য অতি দ্রুতভাবে চলিতে লাগিল —একটির পর একটি, তারপর আর একটি। এযাবৎ লৌহশৃঙ্খলবদ্ধ ছিলাম। যখন বাসনাবিসর্জ্জন শেষ হইল তখন সর্ব্ব শরীর অত্যন্ত লঘু বোধ হইল,—বন্দী যেন শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া বাহিরের উন্মুক্ত আলোকে আসিল। মন এক পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ হইল, এক উজ্জ্বল আলোক হঠাৎ পৃথিবীর সকল পদার্থকেই উজ্জ্বল করিল। শ্রীশ্রীমায়ের

শ্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য তীব্র ইচ্ছা জাগিল। বক্ষে চরণ ধরিয়া মুখে অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিবার জন্য প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। সম্মুখস্থ ইষ্টদেবীর চিত্রে চাহিলাম। সেই সুন্দর গৌর চরণে সেই অলক্তকরাগ কি ছটাই বিকীর্ণ করিতেছে! সেই মধুর চরণে সেই মধুর মঞ্জীর শোভিতেছে! সেই পুষ্পহার-মধ্য-গ্রথিত-রক্তসরোরুহ সেই চরণসরোজে তেমনই ভাবে লগ্ন রহিয়াছে! কি সুন্দর! এই সৌন্দর্য্য ত্যাগ করিয়া আর কোন্ সৌন্দর্য্যের সেবা করিতে ছুটিব? এই নশ্বর জগতে এমন পদার্থ কি আছে যাহার প্রলোভনে এই চরণের প্রলোভন ভুলিব? ছি! মন, তুমি বড় অরসিক—তুমি এমন রসের স্বাদ পাইয়া আবার আপাতমধুর রসে ফিরিয়া যাও। ছি! ছি!! মন, তুমি গোবরের পোকা, তুমি কমলের স্বাদ বুঝিলে না! ভক্তিভরে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। বক্ষমাঝে শ্রীচরণ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মন আসিয়া চরণতলে দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে মন একটি রক্তপদ্মে পরিণত হইল। এই রক্ত পদ্ম এক একটি করিয়া দলদ্বারা মায়ের চরণ বেড়িতে লাগিল—ধীরে ধীরে মনপদ্মমাঝে চরণপদ্ম নিমজ্জিত হইল। মাতৃচরণ বক্ষে করিয়া মনপদ্ম আরও মুদ্রিত হইল,—মনপদ্মের দলগুলি শ্রীচরণে সন্নদ্ধ হইল। আমার বুকের মাঝে মায়ের

চরণ,—সুখে হৃদয় পূর্ণ হইল। মাতৃ-চরণ-সরোজে নিলীন মনভৃঙ্গ মধুপান করিতে লাগিল—মাতৃনাম নীরবে জপ করিতে লাগিল, অমৃত বৃষ্টি হইতে লাগিল। এক স্বর্গীয় সৌরভে হৃদয় ভরিয়া গেল,—সৌরভ ঘ্রাণেন্দ্রিয়পথে বাহিরে আসিতে লাগিল ও অভ্যন্তরে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। এক মধুর হইতে মধুর, অনির্ব্বচনীয় সুখে, শান্তিতে মন ডুবিয়া গেল। মনোরাজ্য ভাসাইয়া অমৃতস্রোত পার্থিব-রাজ্যে আসিল। সেই অমৃতধারা মাখিয়া জগতের সকল বস্তুই অতি মধুর হইয়া উঠিল,—এই কলিকাতার রসহীন ইষ্টকগৃহগুলি এক্ষণে আর কুৎসিত বোধ হইতে লাগিল না, তাহারা এক্ষণে রসপূর্ণ পদার্থ হইল। এই বর্ষাবারিশব্দ, এই শূন্যরচিত ছায়াচিত্র, এই বক্রবারিধারা অত্যন্ত মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি ইহাদের মধ্যে ডুবিলাম, ইহারা ও আমি এক্ষণে আর বিভিন্ন পদার্থ নহি, আমরা এক হইয়া গেলাম, আমরা এক অসীম সচ্চিদানন্দ-সাগরে তরঙ্গাকারে ভাসিতে ভাসিতে কতদূরে চলিলাম। এরাজ্যে যাতনা নাই, ভাবনা নাই, অজ্ঞান নাই, আঁধার নাই,—আছে কেবল অখণ্ড সুখ আর পূর্ণ আলোক! হৃদয় রসে ভরিল। আমি মজিলাম, ডুবিলাম, ডুবিয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীমায়ের মধুময় নামের কি শক্তি! লোকে বলে বাল্য-

কালই শ্রেষ্ঠ সুখের কাল। বার্দ্ধক্যের এই সুখের তুলনায় বাল্যের ঐ সুখ কি সুখ? বাল্যসুখের বর্ণনা করা যায়, এখনকার সুখ বর্ণনাতীত। ঐ সুখ যে একবার ভোগ করিয়াছে অন্য কোনও সুখ তাহার আর ভাল লাগিবে না,—অন্য সকল সুখই তাহার অসুখের কারণ হইবে। তবে যখন কর্ম্ম-দোষে মা তাঁহার স্নেহদৃষ্টি অপসারিত করেন, যখন মোহ আসিয়া নয়ন ঢাকিয়া ফেলে, যখন অসারকে সার বলিয়া মনে হয় তখন বাল্যসুখকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ বোধ হয়। কিন্তু, ভাই, এখনকার সুখের মত সুখ আর নাই। মা! অমনইভাবে সন্তানবক্ষে চরণকমল স্থাপন করিয়া ভঙ্গিভরে দাঁড়াইয়া থাক। মন, অমনই করিয়া ভক্তিভরে শ্রীচরণ জড়াইয়া ধরিয়া রসময় নাম জপ কর। সুধার সাগর, তুমি অমনই করিয়া সকল ভাসাইয়া প্রবাহিত হও। আমার শোক, তাপ, যাতনা, জ্বালা, তোমরা ভাসিয়া গিয়াছ, চিরদিনের মত ভাসিয়া যাও। জগতের পদার্থ সমূহ, এই মুহূর্ত্তে তোমরা যেমন অভিনব-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হইয়া নয়ন মন অপহরণ করিতেছে, চিরদিনই এইরূপ করিয়া তোমাদের এই সঙ্গীর মন ভুলাও। মন, তোমাকে প্রণাম,—তুমি আমাকে কত সুন্দর রাজ্যে লইয়া গেলে! জগৎ,তোমাকে প্রণাম,—তুমি আমার সম্মুখে কি সৌন্দর্য্যই

বিস্তার করিলে! আর তুমি,—তুমি কি করিলে তাহা আর বলিয়া কাজ নাই,—তোমাকে এই কায়, মন, বাক্য, জীবন, যৌবন—সর্ব্বস্ব—দিলাম,—প্রণাম গ্রহণ করিবে না কি!!!

তিনি কোথায় ?

মেঘের বারি বিনা চাতক যদি প্রাণে মরিতে বসে তাহা হইলে আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়, বারি বর্ষে, চাতকের প্রাণরক্ষা হয়। সুধাকরের সুধা বিনা চকোরের প্রাণ যদি বাহির হইবার উপক্রম হয় তাহা হইলে গগনে সুধাকরের আবির্ভাব হয়, কৌমুদীতে নভোমণ্ডল প্লাবিত হইয়া যায়, উন্মুক্ত পক্ষে কৌমুদী মাখিয়া চকোর চাঁদের কোলে কোলে উড়িয়া সুধা পান করে, তাহার প্রাণরক্ষা হয়। যিনি চাতক গড়িয়াছেন, তাহার প্রাণে জলদ-জলের পিপাসা দিয়াছেন, তিনি যদি সময়ে তাহার পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য মেঘের রচনা করেন, তবে যিনি মানুষ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রাণে তাঁহার জন্য পিপাসা দিয়াছেন, মানুষ পিপাসার্ত্ত হইলে তাহার পিপাসু প্রাণ পরিতৃপ্ত করিবার ব্যবস্থা তিনি করিবেন না কেন? যিনি চকোর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে সুধার তৃষ্ণা দিয়াছেন, তিনি যদি তাহার পিপাসিত প্রাণ শীতল করিবার জন্য সময়ে গগনে সুধাংশু রচনা করেন, তাহা হইলে যিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে তাঁহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন,

তিনি কোথায়?

তাহার হৃদয় একান্ত কাতর হইলে সেই পীড়িত অন্তর সুস্থ করিবার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন না কেন? চাতক ও চকোরে তাঁহার আদর, আর মানবে কি তাঁহার অনাদর? তিনি সকলকেই সমান ভালবাসেন। তাঁহাতে ত এরূপ পক্ষপাত সম্ভবপর নহে। তবে এমন হয় কেন? হয়ত যেরূপ প্রবল আকর্ষণে তিনি আকৃষ্ট হন, আমাদের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি সেরূপ প্রবল আকর্ষণ জন্মে না। তাই তাঁহাকে পাই না। যে ঘটনায় মনে আজি আবার এই পুরাতন ভাবনা নূতন করিয়া জাগিয়াছে তাহার প্রসঙ্গই করিতেছি।

সে দিন পৌষের প্রচণ্ড শীতে শীতবস্ত্রাবৃত হইয়া সে যখন কলিকাতা নগরীর শীতজর্জ্জর বাসগৃহ পরিত্যাগ করে, তখন কল্পনাও করে নাই যে, পথিমধ্যে এমন ঘটনা ঘটিবে যাহার স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন হইবে। বিধাতার ব্যবস্থা যে শুধু দুর্জ্ঞেয় তাহা নহে, এক প্রকার অজ্ঞেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার উদাহরণ প্রত্যেক মানবের জীবনেই বোধ হয় প্রচুর,—তাহার জীবনে ত বহু। যখন যাহা আশা করিয়াছে তখন তাহা পায় নাই। যখন যাহার আশা করে নাই, তখন তাহা পাইয়াছে। কেন এমন হয় কে জানে? এই রহস্য চিন্তা করিতে

বসিলেই কবির সেই করুণ উক্তি শুধুই তাহার মনে পড়ে—

"ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই বহু আর ;
বহিয়াছি এ জীবন আশার ও নিরাশার।"

গৃহত্যাগ করিয়া পথে উঠিয়া দেখে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দূর-গমনাগমন এক প্রকার দুরূহ হইয়াছে। বিজলী-যান চলিতেছে না। প্রভু ও ভৃত্যের মনোমালিন্যে ভৃত্যগণ একযোগে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহার বলে প্রভুর বল, তাহার অভাবে তাঁহার কার্য্য অচল। স্থানে স্থানে বহুলোক সমবেত হইয়া কি উপায়ে দূরে যাইবেন তাহার আলোচনা ও ব্যবস্থা করিতেছেন। শীত তখন বেশ প্রখর ছিল। রৌদ্র বেশ তৃপ্তিকর বোধ হইতে লাগিল। পদব্রজেই বাষ্পীয়-শকটের আড্ডায় যাইবে স্থির করিয়া সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। চারিধারে গুরুতর শীত। সেই শীতের চারি ধারে সুখ-স্পর্শ সূর্য্যকিরণ। লাগিতে লাগিল বেশ। সে সুখে চলিতে লাগিল।

বাষ্পীয়-শকটের আড্ডায় উপস্থিত হইয়া দেখে গাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। পুনরায় গাড়ী ছাড়িতে তিন ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। 'কি করিবে?' ভাবিতে ভাবিতে সে পদচারণ করিতে লাগিল। পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত অট্টালিকা

একপ্রকার জনশূন্য। বাহিরে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ, ভিতরে আনন্দ ও আহ্লাদ। সে মনে করিল তথায় যখন আনন্দ মিলিতেছে তখন আর গৃহে ফিরিবার প্রয়োজন নাই, যেমন আনন্দে এই তিন ঘণ্টাকাল পদচারণা করিয়াছে তেমনই আনন্দে এই তিন ঘণ্টা কালও সেই স্থানেই সে অতিবাহিত করিবে। এই আনন্দের অনুসরণে ত কত দূরদেশে সে ভ্রমণ করিল, তবে আর এই আনন্দ-উপভোগ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লাভ কি ?

ক্রমে দুই একজন করিয়া লোক আসিয়া আড্ডা পূর্ণ করিয়া তুলিল। কিন্তু মন এতই শান্ত ছিল যে, এত লোক এই অসময়ে আড্ডায় কেন আসিতেছে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেও ইচ্ছা হইল না। শেষে দুই একজন গাড়ী-ভাড়া-গ্রাহক বাবু বাহির হইয়া ইতস্ততঃ চলাফেরা করিতে লাগিলেন। তাহার পর একসারি গাড়ী আসিয়া আড্ডায় লাগিল। সকলে ভাড়া দিয়া রসিদ লইয়া সেই গাড়ীতে উঠিতে লাগিল। তখন হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল, —তাহার মনে হইল 'গাড়ী কোথায় যাইবে ?' একদল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—সে যে স্থানে যাইতে অভিলাষী গাড়ী তাহার দুইটি আড্ডা পূর্ব্বে অন্য পথে চলিয়া যাইবে। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'যে আড্ডা হইতে গাড়ী অন্য

পথে চলিবে সেই স্থান হইতে তাহার গন্তব্য স্থান কতদূর ?" বাবু বলিলেন, "বহুদূর নহে।" ইতঃপূর্ব্বে এই দীর্ঘ জীবনে কখনও যাহা মনে হয় নাই তাহাই আজি তাহার মনে হইল। সে স্থির করিল, এই গাড়ীতেই যাইবে,—ঐ পথ এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অনাবৃতমস্তকে পদব্রজেই চলিবে। গাড়ী ছাড়িবার তখন আর বিলম্ব ছিল না। তাড়াতাড়ি ভাড়া দিয়া রসিদ লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

যে আড্ডা হইতে পদব্রজে চলিবে স্থির করিয়াছিল গাড়ী আসিয়া সেই আড্ডায় থামিলে সে অবতরণ করিল। কিন্তু কোন্ পথে যাইবে ? পূর্ব্বে আর কখনও এই দিকে সে ত আসে নাই। পথ-ঘাট তাহার ত পরিচিত নহে। এইরূপ অবস্থায় চারিদিকে চাহিতে চাহিতে দেখিল, বাষ্পীয় শকটের পথ এই স্থান হইতে দুই দিকে গিয়াছে। তখন তাহার মনে হইল, এই গাড়ী যে পথে প্রবেশ করিবে সেই পথ তাহার গন্তব্য পথ নহে, কারণ এই গাড়ীর পথে আরও যাইতে হইলে সেই বাবু তাহাকে এই আড্ডায় নামিতে বলিতেন না। তখন গাড়ী কোন্ পথে প্রবেশ করে তাহা দেখিবার জন্য সে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অভিপ্রায়,—গাড়ী যে পথে যাইবে সে পথ ত্যাগ করিয়া

অন্য পথ ধরিয়া চলিবে। এই সঙ্কল্পে মন একেবারে নিশ্চিন্ত না হইলেও এইরূপ কার্য্য করিতে সে অগ্রসর হইল। অবিলম্বে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। বাঁকিয়া বাঁকিয়া গাড়ী একপথে প্রবেশ করিল। অন্যপথ দূরে স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইল। সে দেখিল,—বহুলোক ঐ আড্ডা হইতে বাষ্পীয় শকটের লৌহপথ ধরিয়া অনতিদূরের ঐ পথের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেও তাহাদের দলে মিশিয়া সেই পথের দিকে চলিল। যে স্থানে লৌহপথ দুইদিকে গিয়াছে সেই সঙ্গমস্থানে উপস্থিত হইলে, ভুল পথে যাইতেছি কি না, তাহার এই সন্দেহ হইল। সংশয়ে সে একদল পথিককে পথের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে বুঝিল, ঠিক যাইতেছে।

বাষ্পীয় শকটের পথ বাহিয়া চলিয়াছে। এখন আর শীতের কষ্ট নাই। রৌদ্রের মধুর উত্তাপে সহরের জীর্ণ বাসগৃহের জমাট শীতের দৌরাত্ম্য সে এক্ষণে এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছে। যাঁহারা অগ্রে যাইতেছিলেন তাঁহারা একে একে পথের তারের বেড়া পার হইয়া দুই পার্শ্বের বাস-গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। এখন সে একাকী। মস্তকের উপর অপরাহ্ণের সূর্য্য। শীতের আকাশ নির্ম্মল। শীতের প্রখর সূর্য্য আরামপ্রদ। শীতের পল্লীগ্রাম

নীরব, নিস্তব্ধ। পল্লীপথ ধরিয়া, শীত-সূর্য্যের সুখকিরণ মাখিয়া, আনন্দে সে একাকী আপন মনে চলিয়াছে। পল্লীপ্রান্তরের সৌরভস্পর্শে মন নিমিষে পঞ্চ-বিংশতি বর্ষের কুজ্‌ঝটিকা অপসারিত করিয়া, সহস্র যোজন পার হইয়া, তাহার সেই শৈশবের ক্রীড়াভূমি পল্লীবাসের প্রান্তরে উপস্থিত হইল। সে দেখিল—আম্র-পনস-জম্বু-গুবাক-পরিবেষ্টিত তাহাদের সেই পর্ণকুটীর, কুমুদ-কহ্লার-পরিশোভিত তাহাদের সেই পল্লী-পুষ্করিণী, নীরব-নিস্তব্ধ জনপ্রাণীহীন তাহাদের সেই সুদীর্ঘ পল্লীপ্রান্তর-পথ, পথ-পার্শ্বস্থ তাহার সেই পরমপ্রিয়, প্রকাণ্ড বটবিটপী। মনে পড়িল, এমনই অপরাহ্ণে সেই পথ ধরিয়া তাহার জীবন-প্রভাতের গমনাগমন, আর সেই প্রান্তর-সৌরভ-স্পর্শ-পুলক! ধীরে ধীরে অতীতের সেই দৃশ্য বর্ত্তমানের চিত্রের অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল—এক রমণীয় প্রদেশে আসিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে দীর্ঘ সুপারি-গাছে রক্তবর্ণ সুপক্ক সুপারি ছড়ায় ছড়ায় ঝুলিতেছে। নিকটে সবুজপত্র-শোভিত নারিকেলবৃক্ষে সবুজ নারিকেল কাঁদিতে কাঁদিতে ঝুলিতেছে। অনতিদূরে খর্জ্জুর বৃক্ষে রসের ভাঁড় ঝুলিতেছে। সবুজপত্রবেষ্টিত বেণুকুঞ্জে সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। তাহারই পার্শ্বে একটী বিধবা

তিনি কোথায় ?

খড়বনে একটী গাভীর খোঁটা পুঁতিতেছেন। অদূরে এক পর্ণশালা-সমীপে, একটী আম্রবৃক্ষের নিম্নে, উলঙ্গ ভাবে দাঁড়াইয়া একটী বালক বাঁশের ধনুকে পাকাটীর তীর যোজনা করিয়া একটী জিউলি গাছের শাখা লক্ষ্য করিতেছে। কি জানি কি হইল সে তাহা বলিতে পারে না। শুধু মনে আছে এই সজীবতার মধ্যে আসিয়া তাহার প্রাণ যেন হঠাৎ এক বৃহৎ প্রাণের স্পর্শ লাভ করিল।

সেই স্পর্শে তাহার গতি নিরুদ্ধ হইল। সে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার প্রাণ গুবাকের প্রাণে মিশিল, নারিকেলের প্রাণে মিশিল, খর্জ্জুরের প্রাণে মিশিল, বেণুর প্রাণে মিশিল, বিধবার প্রাণে মিশিল, তীরের প্রাণে মিশিল, বালকের প্রাণে মিশিল, জিউলি গাছের প্রাণে মিশিল, তাহার পর গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "তিনি কোথায় ? যাঁহার এই মহারাজ্য সেই মহারাজ কোথায় ? যাঁহার এই অতুল বিভব সেই বিভবশালী কোথায় ? যাঁহার আমি, যাঁহার গুবাক, যাঁহার নারিকেল, যাঁহার বেণু, যাঁহার খর্জ্জুর, যাঁহার তৃণ, যাঁহার গাভী, যাঁহার বিধবা, যাঁহার আম্র, যাঁহার বালক, যাঁহার ধনুক, যাঁহার তীর, যাঁহার জিউলি, যাঁহার লক্ষ্য সেই সর্ব্বেশ্বর কোথায় ?"

হাহাকারে প্রাণ কাঁদিতে লাগিল—"তিনি কোথায়? তিনি কোথায়? তিনি কোথায়?"

প্রাণের রোদনে ব্যথিত হইয়া বুদ্ধি আসিয়া সহানুভূতি-সহকারে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিল। "কাঁদিতেছ কেন?"

"তিনি কোথায়?"

"তিনি কে?"

"যাঁহার এই সমুদয় বিভব।"

"তাঁহাকে দেখিতেছ না?"

"না।"

"কেন?"

"দেখিতেছি না, তাই বলিতেছি 'দেখিতেছি না,' এর আবার 'কেন' কি?"

"কেন দেখিবে না? দেখিতেছ। শান্ত হইয়া বুঝ।"

"বুঝাও।"

"এই গুবাক তিনি, এই নারিকেল তিনি, এই খর্জ্জুর তিনি, এই বেণু তিনি, এই তৃণ তিনি, এই গাভী তিনি, এই বিধবা তিনি, এই বালক তিনি, এই তীর তিনি, এই ধনুক তিনি, এই জিউলি তিনি, এই লক্ষ্য তিনি, এই যে

তিনি কোথায় ?

'তিনি কোথায় ? তিনি কোথায় ?' করিয়া কাঁদিতেছ তুমি, সেই তুমিই তিনি।"

"তোমার এই প্রবোধ আমি বহুদিন হইতে পাইতেছি, কিন্তু প্রাণ আর আমার মানা মানে না।"

"কেন ?"

"গোল আছে।"

"কি গোল ?"

"গোল ?"

"হাঁ ?"

"তুমি বলিলে আমি তিনি।"

"হাঁ, আমি আবার বলিতেছি "তুমি তিনি।"

"আচ্ছা, আমি যদি তিনি তবে তিনি অমন আর আমি এমন কেন ?"

"কি রকম ?"

"তিনি ঐ সীমাশূন্য নভোমণ্ডল রচনা করিয়াছেন, দিবাভাগে দিবাকরের কিরণে তিনি এই নভোমণ্ডল উজ্জ্বল করেন, নিশায় নিশাকরের কিরণে তিনি এই নভোমণ্ডল প্লাবিত করেন,—অসংখ্য তারকায় এই গগনের শোভা সম্পাদন করেন, তিনি ঐ গুবাক, খর্জ্জুর, নারিকেল রচনা করিয়াছেন, তিনি ঐ প্রান্তরে তৃণ রচনা করিয়াছেন, তিনি

ঐ গাভী গড়িয়াছেন, তাহার স্তনে দুগ্ধ দিয়াছেন, তিনি ঐ রমণী রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রাণে মমতা দিয়াছেন, তিনি ঐ বালক রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রাণে লক্ষ্য-ভেদের বাসনা দিয়াছেন। তিনি এত করিয়াছেন, আমি ত কিছুই পারি না। তিনি যদি আমি, তবে তিনি যাহা পারেন আমি তাহা পারি না কেন ?"

"কি পার না ?"

"ঐ যে বলিলাম। আর অত কথাতেই বা কাজ কি ? ঐ যে শুষ্ক পত্রটী বৃন্তচ্যুত হইয়া লতাতলে নিপতিত রহিয়াছে উহাকে ত উহার প্রিয় বৃন্তে আমি পুনঃ সংযোজিত করিতে পারি না। তিনি এত পারেন আর আমি একটী সামান্য পাতা জুড়িতে পারি না। এই আমি সেই তিনি ?"

"ও ত বুজরুকি !"

"চুপ কর ! তোমার ও চালাকি আমি আর শুনিব না। কথার জবাব দিতে না পারিয়া 'বুজরুকি' বলিয়া উড়াইয়া দাও !"

"মূর্খ, বুঝ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। 'সোহম্'।"

"চুপ রহ।"

"কেন ?"

তিনি কোথায় ?

"যে আমি যথাকালে আহার-বিহার করিতেছি, যে আমার তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমে রোগ হয়, যে আমি শীতের জন্য এই একরাশি গরম বস্ত্র পরিয়াছি, যে আমি রৌদ্রের ভয়ে গৃহের বাহিরে আসিতে পারি না, যে আমি সামান্য গ্রীষ্মে বিদ্যুৎ-ব্যজনের শরণ গ্রহণ করি, যে আমি ক্ষুৎপিপাসার্ত্তকে আহার পানীয় দান না করিয়া আমার ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করি, যে আমি এক কথায় কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যের ক্রীড়নক, সেই আমি তিনি ? এমন ভ্রান্তির ছলনায় তুমি আর আমাকে প্রতারিত করিও না। আমি তাঁহাকে দেখি নাই কিন্তু তাঁহার স্পর্শ পাইয়াছি। তাঁহাকে দেখিলে আমি তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিব। সে ধন আমাকে কাহাকেও চিনাইয়া দিতে হইবে না। তাঁহাকে কি ভুল হয় ? দেখিলেই চেনা যায়। তিনি যে মনের মানুষ। সে চক্ষু দেখিলেই এ চক্ষু বুঝিতে পারিবে। এ আমি সেই তিনি নহি।"

"যদি কথা না শুনিবে তবে কাঁদ।"

"হাঁ, কাঁদিব। প্রাণ তাঁহাকে চায়, তাঁহার জন্য কাঁদিব না ত' কি ভাল মন্দ খাইব পরিব, মজা করিব, আর 'সোহম্' বলিয়া বসিয়া থাকিব ?"

"কাঁদিয়া লাভ কি ?"

"প্রচুর লাভ। তিনি যে দয়ার সাগর। দুঃখ দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। যে তাঁহার জন্য কাঁদে তিনি যে আপন হস্তে তাহার অশ্রু মুছাইতে সাশ্রুনয়নে আসেন। তিনি আসিবেন; অশ্রু মুছাইবেন। সে দিন হাসিব। যাবৎ সে দিন না আসিবে তাবৎ কাঁদিব।"

"তবে কাঁদ।"

তরুলতা-পরিবেষ্টিতা সেই বঙ্গ-পল্লীর সজীব প্রাণের প্রগাঢ় স্পর্শে উদ্বুদ্ধ তাহার প্রাণ অপরাহ্ণ-সূর্য্যের রশ্মি-জালে জড়িত হইয়া সেই পল্লীপথে দাঁড়াইয়া নিতান্ত অনাথের ন্যায় ব্যাকুলভাবে ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল—"তিনি কোথায়? তিনি কোথায়? তিনি কোথায়?"

বাহিরে আসিবে না ?

নববর্ষ-সৌন্দর্য্য-সুশোভিত প্রথম জ্যৈষ্ঠের রক্ত রবি অনতিপূর্ব্বেই পশ্চিম চক্রবালান্তরালে রূপ-সাগরে অদৃশ্য হইয়াছেন। প্রখর-সৌরকর-সন্তাপতপ্তা মেদিনীর সন্তাপ-হরণার্থে সুখস্পর্শ সান্ধ্যসমীরণ মৃদুমন্দ সঞ্চারিত হইতেছে। দুঃসহ-নিদাঘতাপ-নিপীড়িত নরনারী প্রদোষসমীরণসেবন-জন্য দলে দলে নগরোপকণ্ঠস্থ বিশাল, শ্যামল প্রান্তরে ইতোমধ্যেই উপস্থিত হইয়াছেন। ধীরপদবিক্ষেপে সকলেই প্রান্তরের নবদূর্ব্বাদলবক্ষে প্রফুল্লপ্রাণে বিচরণ করিতেছেন, আর নিদারুণ নিদাঘের দুর্ব্বিষহ পীড়ন হইতে কিঞ্চিৎ মুক্ত হইয়া স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছে, সত্য, কিন্তু আঁধার যেরূপ ঘনীভূত হইলে পৃথিবীর মুখ অদৃশ্য হইয়া যায় আজ এখনও অন্ধকার সেরূপ ঘনীভূত হয় নাই। তরল অন্ধকারের যে সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হইলে তরুলতা-গুল্মতৃণ কেমন এক অন্য জগতের অব্যক্ত সৌন্দর্য্য লাভ করে আজি চতুর্দ্দিকস্থ তরুলতা-গুল্মতৃণে সেই অজ্ঞাত রাজ্যের বর্ণনাতীত সুষমা এক্ষণে খেলা করিতেছে।

এমনই দিনে এমনই ক্ষণে সেও আসিয়াছে এই বিশাল প্রান্তরে। কিন্তু, কেন? কে বলিবে, কেন? সকলেরই সহিত দুই একজন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব আছেন। তাহার সহিত কেহই নাই কেন? এই বিপুল বিশ্বে আপনার বলিবার তাহার কি কেহ নাই? যদি ভাই ভগিনী কেহ থাকিত, তাহা হইলে কি এই নিদাঘ-প্রদোষে এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাহার সহিত সান্ধ্যভ্রমণে তাহাদের কেহ আসিত না? আচ্ছা, এই বৃহৎ নগরে তাহার বন্ধু-বান্ধব কি একজনও নাই? এই প্রকাণ্ড প্রান্তরে কাহা-কেও ত একাকী ভ্রমণ করিতে দেখিতেছি না, সকলেরই ত সঙ্গী আছে, কেবল তাহার কোন সহচর নাই। তবে কি এই সুবিশাল জগতে সে নিতান্তই একাকী? কে জানে, একাকী কি তাহার কেহ আপনার জন আছে?

আচ্ছা, সে এই সন্ধ্যায় এই প্রান্তরে আসিয়াছে কেন? ভ্রমণ করিতে? তাহা ত মনে হয় না। যদি ভ্রমণ করিতে আসিত, তাহা হইলে ত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। কিন্তু ভ্রমণ ত সে করিতেছে না। ঐ যে স্থানে উচ্চভূমি নিম্নদিকে ঢালু হইতে আরম্ভ করিয়াছে সেই উন্নতাবনত ভূমিরেখায় চৈত্রশ্রীমণ্ডিত, নাতিবৃহৎ অশ্বত্থবটবিটপীমাঝে বহুক্ষণ ত সে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সকলে যেমন ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে

ফিরিতেছে, সে ত তেমন ঘুরিতেছে ফিরিতেছে না। তবে কি কোন প্রিয়জনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে ?—সে আসিলে কি তাহার সহিত মিলিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিবে ? কিন্তু কাহারও প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছে তাহাও ত মনে হয় না। যদি কাহারও প্রতীক্ষা করিত, তাহা হইলে তাহার সম্মুখ দিয়া এই যে বহু নরনারী চলিয়া যাইতেছে ইহাদের প্রতি ত সে দৃষ্টি রাখিত। কিন্তু এই অগণ্য নরনারীর কাহাকেও ত সে চাহিয়াও দেখিতেছে না। আর যদি কাহারও প্রতীক্ষা করিত তাহা হইলে তাহার ভাব প্রতীক্ষাচঞ্চল হইয়া উঠিত। এই একটু পূর্ব্বেই একজন প্রৌঢ় কাহারও অপেক্ষায় এই প্রান্তর-পার্শ্বে ঐ বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন; কত চঞ্চল তাঁহার ভাব,—নিমিষে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছিলেন, প্রতি নর-নারীর প্রতি চাহিতেছিলেন, আর যাহার প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন তাহাকে তাহাদের মধ্যে না পাইয়া বিষম বিরক্ত হইতেছিলেন, মুখে সেই বিরক্তি-চঞ্চল ভাবের ছায়া পড়িতে-ছিল। সে যদি কাহারও প্রতীক্ষা করিত, তাহা হইলে তাহার ভাবও ঐ প্রৌঢ়ের ভাবের ন্যায় চঞ্চল হইত। কিন্তু সে ত একবিন্দুও চঞ্চল নহে,—একেবারে স্থির, শান্ত, মুখে সুন্দর সৌম্যভাব। উচ্চাবচভূমিরেখায়, উভয়-পার্শ্বস্থ অশ্বত্থ

ও বটের ন্যায় স্থির, শান্ত হইয়া সৌম্যমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। মৃদু পবনে তরুপত্র কম্পিত হইতেছে, কিন্তু তাহার দেহে বিন্দুমাত্রও স্পন্দন নাই। এই নিদাঘ-প্রদোষে,প্রান্তর-মাঝে, নিম্নোন্নতভূমিরেখায়, অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ মাঝে, নিস্পন্দ দেহে সে তবে কেন স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া ? এমন কি হইতে পারে যে, যাহাকে প্রাণ দিয়াছিল, যাহাকে সঙ্গে করিয়া এমনই সন্ধ্যায় শীতল সমীর সেবন করিবার জন্য হাসিতে হাসিতে এই প্রান্তরের এই স্থানে আসিত, সে আর এখন নাই, এই প্রান্তরের এই প্রদেশে আসিয়া তাহার সুখ-স্মৃতি মনে জাগরিত হইয়াছে, তাই সেই দূর অতীতের আবর্ত্তে তাহার বাহ্যজ্ঞান নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে ?—হইতে পারে কি যে এই নিদাঘ-প্রদোষে, এই প্রান্তর-মাঝে, এই উন্নতাবনত ভূমি-রেখায়, এই অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ-মাঝে সেই বহুদিনগত অতীতের মধু-মুখখানি তাহার হৃদয়ের অন্তস্থলে ভাসিয়া উঠিতেছে ? হইলেও হইতে পারে। না, হইতে পারে না। কেন পারে না ? পাইয়া হারাইলে, যে হারায় তাহার মুখমণ্ডলে অপহৃত সম্পদের নিভৃত, নীরব চিন্তার যে ছায়া অঙ্কিত হয় তাহার মুখমণ্ডলে ত সে ছায়া অঙ্কিত হয় নাই। যে সত্য সত্যই হৃদয়ের ধন হারাইয়াছে সে যতই সুশ্রী হউক না কেন তাহার পরিপূর্ণ শ্রীর অভ্যন্তরে

করাল রাহুর কৃষ্ণ স্পর্শ লিপ্ত রহিবেই রহিবে। যাঁহার দৃষ্টি প্রখর নহে তিনি সেই রূপরাশিতে পূর্ণচন্দ্রের প্রভা সন্দর্শন করিলেও যাঁহার দৃষ্টিশক্তি বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করিতে শিখিয়াছে তিনি দেখিবেন শরতের পূর্ণচন্দ্র রাহুর স্পর্শ অঙ্কিত হইয়াছে। কৈ, তাহার রূপরাশিতে ত রাহুর স্পর্শ দৃষ্ট হইতেছে না ? তবে ত যাহাকে ভালবাসিয়াছিল তাহাকে হারাইয়া আজি এই নিদাঘ-সন্ধ্যায় এই প্রান্তর-মধ্যে সে সেই হৃদয়ের ধনকে আপনহারা হইয়া ভাবিতেছে না। তবে সে ঐ স্থানে এমনই ভাবে দাঁড়াইয়া কেন ? এই অনতিদূরে, এই পরিখাপার্শ্বে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া দেখি যদি কিছু বুঝিতে পারা যায়।

এই ত জনতা কমিয়া যাইতেছে। সান্ধ্য-সমীরণে শীতল হইয়া নরনারী প্রান্তর হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতেছে। দেখি, সে এখন কি করে। ঐ ত উজ্জ্বল চক্ষু চলিতেছে, উচ্চ ভুমি কেমন অল্প অল্প করিয়া নিম্ন হইয়া সবুজতৃণাচ্ছাদিত, নয়নরঞ্জন ঢালের রচনা করিয়াছে তাহা দেখিতেছে। আচ্ছা, এত বয়স হইয়াছে, ও কি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও এমন ঢালু জমি দেখে নাই ? কি আছে এই নবজীবনসঞ্চারোজ্জ্বল, শাদ্বল ঢালু দেশের অভ্যন্তরে যে, সে তাহা এতাদৃশ অভিনিবেশসহকারে

সন্দর্শন করিতেছে? এই প্রাণপ্রবাহ-পরিপ্লাবিত, হরিদ্বর্ণ ঢালুভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে উহার চক্ষু দুইটী যে সদানন্দ বালকের চক্ষুর ন্যায় আনন্দে হাসিয়া উঠিতেছে। ঐ যে, চতুর্দ্দিকে কেহ নাই দেখিয়া ঐ নবদুর্ব্বাদলশোভিত উন্নত ভূমি হইতে সে ধীরপাদক্ষেপে কেমন আদরে নিম্ন-ভূমিতে অবতরণ করিতেছে, আবার কেমন মৃদু-মন্দ-পদসঞ্চারে নবদুর্ব্বাদলশোভিত নিম্নভূমি হইতে উচ্চভূমিতে সানন্দে আরোহণ করিতেছে! বালক যেমন কথনও কথনও আপনহারা হইয়া একাকী নিভৃত স্থানে ক্রীড়া করে, সে যে তেমনই ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। বালক সহজেই আনন্দ লাভ করে—সবুজতৃণশোভিত ক্ষেত্রে আসিয়া উচ্চ নীচ ভূমিতে আরোহণ অবরোহণ করিয়া সে পৃথিবী বিস্মৃত হইতে পারে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই তুচ্ছ ক্রীড়ায় কি এতাদৃশ আনন্দ লাভ করিতে পারে? ঐ যে উজ্জ্বল, শাদ্বল ঢালু ভূমির মধ্যদেশে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ঐ যে হাসিতে হাসিতে আবার অগ্রসর হইতেছে। উদ্‌ভ্রান্ত না কি? একাকী এই নিম্নোন্নত প্রদেশে আরোহণ অবতরণ করিতেছে, আর একাকী হাসিতেছে! কোন্ সুধাকরের সুধাময় আকর্ষণে তাহার হৃদয়-সাগরে এই আনন্দোচ্ছাস ছুটিতেছে!

বাহিরে আসিবে না ?

ঐ যে, উন্নতাবনত ভূমিরেখায় দণ্ডায়মান হইয়া অশ্বত্থ-বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। ঐ যে হাসিতে হাসিতে অশ্বত্থাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। নাতিবৃহৎ অশ্বত্থের নিম্ন-দিকের শাখার একটী নধর, উজ্জ্বল পত্র স্পর্শ করিয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে ও কি বলিতেছে ? "কি সুন্দর !" আচ্ছা, এ কেমন ? কত নরনারী ভ্রমণ করিতেছিল, তাহাদের কাহারও সহিত মুখের কথাটিও বলিল না, আর এখন যখন তাহারা চলিয়া গেল, তখন তুচ্ছ তরুপত্র স্বকরে গ্রহণ করিয়া সোহাগ করিতেছে ? উন্মাদগ্রস্ত হইবে কি ! কত প্রকারের পাগল আছে। কে জানে কি ?

ঐ যে অশ্বত্থপত্র পরিত্যাগ করিয়া আবার উচ্চভূমি হইতে বক্রাকারে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতেছে। ও কি ? হস্ত পদ প্রসারিত করিয়া নবদূর্ব্বাদলক্ষেত্রে বসিয়া পড়িল যে ! কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নবদূর্ব্বাদল সন্দর্শন করিতেছে, বুঝি কাহার আবির্ভাবে শুষ্ক তৃণ সজীব হইয়া উঠিল তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য দূর্ব্বাদলের অন্তঃস্থলে দৃষ্টি প্রবিষ্ট করিতে চাহে। এমন সোহাগে, সাগ্রহে প্রণয়ীও ত প্রণয়িনীর মুখারবিন্দ প্রতি অনিমিষে চাহিয়া থাকে না। বুদ্ধিমান্ মানুষ কি এতাদৃশ বুদ্ধিহারা যে তুচ্ছ মাঠের অযত্ন-সম্ভূত, সামান্য পশুর আহার অকিঞ্চিৎকর ঘাসের প্রতি

এতাদৃশ লোলুপনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। ঐ যে কোমল-করে দুর্ব্বাদেহে সপ্রণয়ে হস্তাবর্ত্তন করিতেছে। অদ্ভুত!

শাদ্বল ক্ষেত্র হইতে নীলনলিনাভ নয়ন তুলিয়া ঐ যে সুনীল গগনমণ্ডল সন্দর্শন করিতেছে। বিশাল লোচন বিশাল গগনে সন্নিবিষ্ট, অপলকে যেন সে কি দেখিতেছে। ঐ সীমাহারা নভোমণ্ডলে দিশাহারা হইয়া কাহাকে খুঁজিতেছ, সখে! তোমাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিলাম কেন, জান? সেই অপরাহ্ণ হইতে এই সন্ধ্যাবসান পর্য্যন্ত আমি তোমাকে দেখিতেছি, তোমার হাবভাব অনুভব করিতেছি আর অজ্ঞাতসারে কেমন তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছি, আর ভাবিতেছি যদি সত্যই তোমার কেহ না থাকে তবে তোমার কেহ হই। পাগলের, শুনি, প্রবল আকর্ষণ-শক্তি আছে; সে, নাকি, সহজ-মানুষকে সঙ্গ-প্রভাবে পাগল করিতে পারে। তুমি আমাকে পাগল করিতেছ না কি, ভাই?

হাঁ, এতক্ষণে তাহার মুখে প্রতীক্ষার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে! কাহাকে দেখিবার লোভে গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সে পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিতেছে! এত সূক্ষ্মভাবে গগনমণ্ডল পরিদর্শন করিতেছে যে, কেহ যে এতাদৃশ বৃহৎ গগনের কোনও এক কোণে

গা ঢাকা দিয়া অদৃশ্য রহিবেন তাহার উপায় সে রাখিতেছে না। আকাশে কাহাকে খুঁজিতেছ, বন্ধু! আকাশ ত শূন্য। শূন্য হইতে কে আসিতে পারে, ভাই! লোকালয়ে অনুসন্ধান করিলে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, সে জনসমাকুল স্থান। অরণ্যে খুঁজিলেও কাহারও না কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে, বনেও অসভ্য মানুষ কোথায়ও কোথায়ও বসবাস করে। কিন্তু শূন্য আকাশে অনুসন্ধান করিলে তোমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে শূন্য হইতে কেহ আসিতে পারিবে কি, ভাই ?

নবদুর্ব্বাদল-সমাচ্ছন্ন, জনশূন্য, বিশাল প্রান্তরের মধ্য দিয়া ধীরচরণে সে যে ঐ দক্ষিণাভিমুখে চলিতেছে, একপদ অগ্রসর হইতেছে, আর থমকিয়া দাঁড়াইতেছে। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে উৎকণ্ঠিতনয়নে চাহিয়া কাহাকে অনুসন্ধান করিতেছে, যেন কাহার আসিবার কথা আছে—যাহার আসিবার কথা আছে সে বুঝি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, সর্ব্বদিক্ হইতেই আসিতে পারে। চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে না দেখিয়া পুনরায় পায়ে পায়ে অগ্রসর হইতেছে। আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে, আবার চতুর্দ্দিকে চাহিতেছে। না পাইয়া আবার পাদক্ষেপ করিতেছে। প্রতি

পদক্ষেপেই যেন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, প্রতি নিমিষেই সে যেন উপস্থিত হইতে পারে।

এতাদৃশ উৎকণ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতে হইতে সে এক প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের সমীপে উপস্থিত হইল। বহুদিন হইল এই অশ্বত্থের যৌবন অপগত হইয়াছে, সকল সময়ে এক্ষণে আর তরুবরের সেই সুষমা দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু মধু মাসের সুমধুর স্পর্শে বৃদ্ধ যেন পুনরায় নবযৌবন লাভ করিয়াছে। তাহার প্রাচীন, শুষ্ক, রসহীন দেহে আবার রসের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার শীর্ষদেশে আবার নবপত্র রাশি শোভিতেছে। নিদাঘ-সন্ধ্যার দ্রুতসঞ্চরমাণ-সমীরণ-সন্তাড়নে সন্তাড়িত হইয়া অশ্বত্থের সেই চিরকম্পনশীল নবপত্ররাশি তর-তর-তরে ক্ষিপ্র কম্পিত হইতেছে, আর মৃদু মর্ম্মরে তাহার নূতন উল্লাস অভিব্যক্ত করিতেছে। যাঁহার মৃত-সঞ্জীবনী শক্তিতে বহুযুগের প্রাচীন তরু আজি আবার তরুণ শ্রী লাভ করিয়াছে তাঁহারই স্পর্শলাভলোভে এই সন্ধ্যায় সে কি এমনই উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় এই নীরব প্রান্তরে নীরবে ভ্রমণ করিতেছে ?

চৈত্রশ্রীসম্পন্ন, প্রাচীন তরুর সমীপস্থ হইতে না হইতেই অশ্বত্থপত্ররাশির দ্রুতকম্পনদর্শনে এবং মৃদুমর্ম্মরশ্রবণে তাহার প্রাণ উদ্বেল হইয়া উঠিল। এতক্ষণ সে কোন

প্রকারে ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিল কিন্তু আর পারিল না, তাহার প্রাণ একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যাহাকে সে এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হরিৎক্ষেত্রে, উজ্জ্বল পত্রে, অনন্ত আকাশে, ধীর সমীরণে অনুসন্ধান করিতেছিল, সে যেন ঐ পত্র-রাশির দ্রুত কম্পনে এবং মৃদু মর্ম্মরে ব্যক্ত হইয়া উঠিল, এতক্ষণ ধরি ধরি করিতেছিল, এখন যেন ধরিয়াই ফেলিল। কিন্তু কৈ! সে ত আসে আসে আসে না! ঐ মর্ম্মরধ্বনিতে সে যে তাহার প্রণয়-সম্ভাষণ জানাইতেছে, ঐ পত্র-পুঞ্জের তর-তর-তরে সে যে তাহার চিরমধুর খেলা খেলিতেছে। এতই নিকটে, কিন্তু, কৈ? তাহাকে ত দেখিতে পাইতেছে না। কৈ? সে আসিয়া ত আঁখির আগে দাঁড়াইল না! তাহার সেই রসপূর্ণ নয়নের রসপূর্ণ দৃষ্টি ত উহার মুখে স্থির-স্থাপিত করিয়া সে ত রঙ্গভরে রসের হাসি হাসিল না! কৈ? আঁখির মিলন ত হইল না! সে ত ঐ তরতর গতিতে অশ্বত্থপত্রের সহিত খেলিতেছে, সে ত ঐ মর্ম্মর ধ্বনিতে তাহার কথা কহিতেছে, কিন্তু ও ত' রূপক চাহে না, ও যে চাহে সেই সত্য আঁখির সেই সত্য সম্মিলন,—এই মিলন-আশে ও যে দীর্ঘ জীবন প্রতীক্ষা করিতেছে।

ধরি ধরি করিয়া ধরিতে না পারিয়া তাহার প্রতি অঙ্গ-

উৎকণ্ঠায় কাঁপিতে লাগিল, বিরহ-ব্যথায় তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইতে লাগিল, দুঃসহ যাতনা বক্ষে করিয়া সে সেই অশ্বথতলে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ সে দেখিল, এক অত্যুজ্জ্বল আলোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল। সেই আলোকে সূর্য্যের আলোকের ন্যায় সেই রাত্রিতে সর্ব্বদিক সম্যক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যের আলোক যেমন সমুজ্জ্বল এই আলোকও তেমনই সমুজ্জ্বল। প্রভেদ—সূর্য্যের আলোক একটু তীব্র, এই আলোক একটু স্নিগ্ধ, সূর্য্যের আলোক রজতপ্রভ, এই আলোক স্বর্ণাভ। কিন্তু সূর্য্যের প্রখর কিরণে দেহ যেরূপ দগ্ধ হয় এই স্নিগ্ধ আলোকেও তাহার দেহ তদ্রূপ দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সমুজ্জ্বল আলোক তাহার দেহ দগ্ধ করিতে করিতে তাহার প্রাণ আক্রমণ করিল। তাহার প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল। অসীম জ্বালায় গগনে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখে সুনীল গগনে প্রকাণ্ড চন্দ্র স্থিরভাবে বসিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে ধরণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। এ কি তবে চন্দ্রের দ্যুতি? তাহার এই দীর্ঘ জীবনে সে ত বহু রজনীতে প্রান্তরে দাঁড়াইয়া গগনে ভুবনে চন্দ্রদ্যুতি অবলোকন করিয়াছে, কিন্তু কখনও ত এতাদৃশ সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্না এই দীর্ঘজীবনে সে দেখে নাই, আর কখনও ত সুধা-শীতল

কৌমুদীর এই দারুণ দাহিকাশক্তি অনুভব করে নাই। এত বড় চাঁদ ? আজ কি তিথি ? পূর্ণিমা। তা বহু পূর্ণিমার চন্দ্র ত সে ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছে, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে কখনও ত পূর্ণচন্দ্রের অগ্নিতে সে এমন ভাবে দগ্ধ হয় নাই। এ কেমন পূর্ণিমা ? এ বৈশাখী পূর্ণিমা। বৈশাখী পূর্ণিমায়ই ত কুমার শাক্য-সিংহ অবতীর্ণ হয়েন। এমনই জ্যোৎস্না-স্নাতা রাহুল-জন্ম-যামিনীতেই নিঃশব্দ-পদসঞ্চারেই ত কুমার রাজভবন পরিত্যাগ করেন! এমনই কৌমুদীময়ী নিশীথিনীতেই ত অস্থিকঙ্কালাবশেষ সন্ন্যাসী বোধিদ্রুমতলে সিদ্ধার্থ হয়েন। এই বৈশাখী পূর্ণিমায়ই ত বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করেন! তবে কি, তবে কি এই শুভ শর্ব্বরীতে, এই নীরব, নিস্পন্দ, নির্জ্জন, শ্যামল প্রান্তরে, এই সন্তাপজনক-সুধাংশু-সুধা-সমুদ্রমাঝে, এই সুদূর অতীতের সুখ-স্মৃতিমাঝে, এই শান্ত-সুস্থির-ভাবময়-বৌদ্ধমূর্ত্তি-ধ্যানমাঝে সেই সন্তাপহারিণী তাহার সন্তাপ হরণ করিবেন ? কে জানে তাঁহার লীলা ? কে জানে, আজি তাঁহার প্রাণে কোন লীলা জাগিয়াছে ? সেই ক্ষিপ্রসঞ্চরমাণ, মর্ম্মরধ্বনিকারী অশ্বত্থপত্ররাশির তলে দাঁড়াইয়া, ঊর্দ্ধে চাহিয়া সে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, আর হিমাংশুর হিমকরস্পর্শে দগ্ধ হইতে লাগিল। অশ্বত্থ-বৃক্ষের দক্ষিণাভিমুখী এক প্রশাখার পত্ররাশি কখন কখন

বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া উত্তরাভিমুখে চালিত হইতে লাগিল এবং ঐ প্রশাখার একদেশ ক্ষণিকের জন্য এইরূপে পত্রাবরণমুক্ত হইতে লাগিল, আর পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বল সেই পত্রাবকাশে সেই শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় রহিয়া রহিয়া সে দেখিতে লাগিল, সর্ব্বক্ষোভ-পরিশূন্য, নিমীলিত-নয়ন-কমল, আনন্দপ্রস্রবণ, নির্ব্বাত, নিষ্কম্প, স্থির, সুপ্ত, শান্ত একখানি মুখ। মুখখানি পলকের তরে দেখিতে না দেখিতেই পত্র-রাশি ফিরিয়া আসিয়া অশ্বথ-প্রশাখার সেই মুক্তস্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল, আর সেই মুখখানি সেই পত্ররাশির মাঝে হারাইয়া যাইতে লাগিল। এই আছে, এই নাই; এই আছে, এই নাই;—এইভাবে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসরের পরপার হইতে যে মুখখানি আজি এমনই করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে সেই মুখখানির অভ্যন্তর হইতে তাহার ঈপ্সিত মুখখানি বাহির হইবে। কিন্তু হয় হয় হয় না, হয় হয় হয় না। এমনই আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, আগ্রহে, উৎকণ্ঠায়, বেদনায় রজনী গভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু যাহার জন্য এই আকুল প্রতীক্ষা সে আসিল কৈ? প্রাণ ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িল,—সে আর সেই তরুতলে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে পারে তাহার চরণে এমন শক্তি আর রহিল না। গভীর

বাহিরে আসিবে না?

রজনীতে প্রাণের অসহ্য জ্বালায় "বাহিরে আসিবে না, মা?" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া পায়ে-পায়ে-গড়া প্রান্তরপথের পূর্ণ-চন্দ্র-কিরণ-তাপিত বালুকায় সে অবসন্নদেহে পড়িয়া গেল। তরুপত্র দ্রুততর ভাবে তর তর করিয়া উঠিল। উজ্জ্বল আলোক অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শরতে শ্রীশ্রীশারদা।

অনাবিল শারদ প্রভাতের তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণে কোন্ রূপময়ীর রূপের রমণীয় রাগ রাজে ঐ? কৈশোরে, —আমার এই জীবনের সেই সুবিমল শারদ প্রভাতে, সহচরগণসমভিব্যাহারে শুষ্ক-কর্দ্দম পল্লীপথে খেলিতে খেলিতে যখনই শারদ প্রভাতের এই তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ পল্লী-প্রান্তরে খেলিতে দেখিতাম, তখনই উচ্ছ্বসিত উল্লাসে বিভোর হইতাম! যৌবনে, আমার এই জীবনের সেই কুহক-জড়িত শারদ মধ্যাহ্নে,—উন্মুক্তবাতায়ন-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের কুহক-লেখনী-প্রসূত তপোবনবাসিনী অপ্সরোদুহিতার প্রণয়-কাহিনী কুহকভরে পাঠ করিতে করিতে যখনই দেখিতাম শারদ প্রভাতের এই তরুণ-অরুণ-হিরণকিরণ বাতায়ন-নিম্নস্থ পেয়ারা গাছের পত্রশীর্ষে কুহক রচনা করিতেছে, তখনই সেই অনির্ব্বচনীয় কুহকে মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম, অপ্সরোদুহিতার কুহকময় প্রণয়-কথা পড়িয়া রহিত, আমি অনিমেষ-নয়নে পেয়ারাপত্রে শারদ প্রভাতের এই তরুণ-অরুণ-হিরণ--কিরণের মধুরলীলা একাগ্রচিত্তে অবলোকন

করিতাম। আজি প্রৌঢ়ে,—আমার জীবনের স্মৃতি-স্বপ্ন-পরিবেষ্টিত এই শারদ অপরাহ্ণে,—আপন কক্ষে বসিয়া আপনার অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে শারদ প্রভাতের এই তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ গৃহকুট্টিমে খেলিতেছে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছি। শারদ প্রভাতের এই তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ দেখিয়া কৈশোরে হাসিয়াছি, যৌবনে হাসিয়াছি, আজি এই প্রৌঢ়েও হাসিতেছি।

কেন? শারদ প্রভাতের এই তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ অবলোকন করিয়া প্রাণ এমন পুলকিত হয় কেন? হইবে না?—শারদ প্রভাতের এই তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ দেখিয়া প্রাণ পুলকিত হইবে না? শারদ প্রভাতের বালার্ক-কিরণে প্রাণ ত পুলকিত হইবেই। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, হেমন্তে, শীতে ও বসন্তে, সর্ব্ব ঋতুতেই ত কাননে কান্তারে, পর্ব্বতে পুলিনে, সর্ব্বত্রই বালার্কের কিরণ শোভা প্রভাতে সন্দর্শন করিয়াছি, কিন্তু শারদ প্রভাতে তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণে যে রূপের লীলা দেখি অন্য কোনও ঋতুতেই ত বালার্ক-কিরণে সে রূপের ছায়াও দেখি না। শারদ প্রভাতের বালার্ককিরণ যে বড়ই অপরূপ! শারদ প্রভাতের তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ যে, যাহাকে

প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসি তাহারই অচির-আগমন-বার্ত্তা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া দেয়! শারদ প্রভাতের তরুণ-অরুণ-হিরণ কিরণে যে রূপময়ীর অপরূপ রূপের রমণীয় রাগ ফুটিয়া উঠে!

বর্ষপরে, বর্ষান্তে আজি আবার অনাবিল শারদ প্রভাতে তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ মন মজাইয়া রূপের ছটা বিকীর্ণ করিতেছে। রাজরাজমোহিনী! তুমি যে বর্ষ পরে বাঙ্গালার পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপ রূপে ভাসাইতে আসিতেছ তাহারই পূর্ব্বচিহ্ন এই তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ! এই তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ তোমার অপরূপ রূপের রশ্মিরেখা! তুমি আসিতেছ, মা! তাই তোমার রূপের রশ্মি তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণে চাপিয়া ইতোমধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছে। শারদ প্রভাতের তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ ত অপরূপ-রূপময় হইবেই। যাঁহার রূপের রেখা এই তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ তিনি যে রূপে রাজরাজেশ্বরী! রূপে রূপে, তেজে তেজে গঠিত তোমার রূপ-ময়ী মূর্ত্তি যে, মা! ব্রহ্মতেজে, বিষ্ণুতেজে, মহেশ্বরতেজে, যমতেজে, ইন্দ্রতেজে চন্দ্রতেজে, বায়ুতেজে, বরুণতেজে, কুবেরতেজে, অনলতেজে, অনিলতেজে নির্ম্মিত যে 'জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তর' জ্বলন্ত-পর্ব্বতসম তেজোরাশি—তুমি যে তাহারই

শরতে শ্রীশ্রীশারদা।

জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী মূর্ত্তি, মা! তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী হইবে না ত কে আর জ্যোতির্ম্ময়ী হইবে, জননি? তুমি যে "সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।" তোমার রশ্মিরেখা তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ অপরূপ-রূপময় হইবে না ত, কি আর অপরূপ-রূপময় হইবে, মা! আইস, অপরূপ-রূপময় তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ, আমি তোমাকে সাদরে বরণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করি। আইস, অপরূপ-রূপময় তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণের রাণী, আইস। আইস, জ্যোতির্ম্ময়ি, তোমার জ্যোতিতে বাঙ্গালার অন্ধকারাবৃত, পুরাতন, জীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া বর্ষপরে তোমার বাঙ্গালার গৃহে ফিরিয়া আইস। আইস, জ্যোতির্ম্ময়ি, তোমার জ্যোতিতে আমার অন্ধকারাবৃত পুরাতন, জীর্ণ হৃদয়মণ্ডপ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া বর্ষপরে তোমার এই হৃদয়মণ্ডপে ফিরিয়া আইস!

ভক্তিপরিপূর্ণহৃদয়ে, "প্রণতিনম্রশিরোধরাংসে," গললগ্নীকৃতবাসে, কৃতাঞ্জলিপুটে, নতজানু হইয়া, উৎকণ্ঠাস্ফুটিতচিত্তে তোমাকে আবাহন করিতেছি কেন, মা? তোমাকে ডাকিব না ত আর কাহাকে ডাকিব?—তুমি যে আমার জননী। বিপন্ন হইলে সন্তান ত চিরদিন 'মা, মা' বলিয়াই কাঁদিয়া থাকে। সে জানে তাহার জননী আসিলেই

তাহার বিপদের প্রতিবিধান হইবেই হইবে। আর তুমি যে দুর্গতিহারিণী জননী শ্রীশ্রীদুর্গা। দুর্গতিতে তোমার শরণ না লইয়া অন্য কাহার আশ্রয় যাচিব, জননি? এখন যেমন দুর্গতি হইয়াছে এমন দুর্গতি কি আর কখনও হইয়াছিল, ত্রিকালদর্শিনি? উদরে অন্ন নাই, জঠরে ক্ষুধার অনল সদাই জ্বলিতেছে। সেই জ্বালায় প্রাণ পাগল-প্রায়। পশুর খাদ্য ঘাস খাইতেছি, মা, ঘাস খাইতেছি। দুগ্ধ অভাবে জননীর বক্ষে শিশু সন্তান ঢলিয়া পড়িতেছে, মা! ঢলিয়া পড়িতেছে। পরিধানে বসন নাই,—ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া তোমারই অচিরোদ্ভিন্ন-যৌবন-মূর্ত্তি যখন লাজজড়িত চরণে রাজপথে চলিতে যাইয়া সরমে মরণ কামনা করে তখন আর দুর্গতির বাকি কি আছে, মা, বাকি কি আছে? "শীত-আতপ-বাত-বরিথ" হইতে দেহরক্ষা করিতে পারি এমন আবাস নাই, মা, এমন আবাস নাই। বড় সাধের পুত্রের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না,—কুশিক্ষা লাভ করিয়া সে এখন তোমার নামে ব্যঙ্গ করে, মা, তোমার নামে ব্যঙ্গ করে! প্রাণের পুত্তলি তনয়ার বিবাহ দিতে না পারায় লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন হইয়া আছি,—তোমার যুবতী মূর্ত্তি কখনও বা দিশাহারা হইয়া অনলে প্রাণ সমর্পণ করিতেছে, মা, প্রাণ

সমর্পণ করিতেছে। শুদ্ধান্তচারিণী, অসূর্য্যম্পশ্যা সহধর্ম্মিণীর সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিতেছি না, মা, সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিতেছি না। দুর্গতির কথা আর কত বলিব, জননি, আর কত বলিব ? চরণে চলিব বলিয়া তুমি চরণ দিয়াছিলে, এখন কিন্তু চলিতেছি উদরে ভর দিয়া,—তুমি মানুষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলে, আমরা সরীসৃপ হইয়াছি, মা, আমরা সরীসৃপ হইয়াছি। অধিকতর দুর্গতি এই যে এ দুর্গতি বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের তাড়নায়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের প্রলোভনে এমন কুহকগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আঁখি ফুটিয়াও ফুটে না, প্রাণ জাগিয়াও জাগে না, বুদ্ধি বুঝিয়াও বুঝে না। জ্যোতির্ম্ময়ালোক-মুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে ছুটিতেছি, পক্ষ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তবুও ছুটিতেছি, মা, তবুও ছুটিতেছি। অহিতুণ্ডিকের বাঁশীর স্বরে মুগ্ধ হইয়া ধাবিত হইতেছি,—বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিতেছে, তবুও ধাবিত হইতেছি, মা, তবুও ধাবিত হইতেছি। মা, আমার যে এখন সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের দশা, মা! তাই এই ভক্তিপরিপূর্ণ হৃদয়ে, প্রণতিনম্রশিরোধরাংসে, গললগ্নীকৃত-বাসে, কৃতাঞ্জলিপুটে, নতজানু হইয়া, তোমাকে ডাকিতেছি, মা, তোমাকে ডাকিতেছি। মহামায়ে! তুমি অঘটন-ঘটন-

পটীয়সী,—আমি বুঝিয়াছি তুমিই আমার চিত্তাকর্ষণ করিয়া আবর্ত্তময় মোহগর্ত্তে নিপাতিত করিতেছ। দুর্গতিহারিণি, আমি বুঝিয়াছি তুমি প্রসন্না হইয়া মানবকে জন্মমৃত্যুসংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিতে পার। কুহকিনি, তোমার কুহকে সকল দুর্গতি ঘটিতেছে। কুহক-নিরসন-কারিণি, তোমার ইচ্ছাতেই সকল দুর্গতি যাদুকরের যাদুর ন্যায় মুহূর্ত্তে শূন্যে বিলীন হইতে পারে। তুমি সকলই করিতে পার, মা,—তুমি যে "নিঃশেষ-দেবগণ-শক্তিসমূহমূর্ত্তি"। তুমি শরণাগতকে উদ্ধার করিয়া থাক, জননি,—তুমি যে "শরণা-গত-দীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণা।" তাই এই ভক্তি-পরিপূর্ণ হৃদয়ে, প্রণতিনম্রশিরোধরাংসে, গললগ্নী-কৃতবাসে, কৃতাঞ্জলি-পুটে, উৎকণ্ঠা-স্ফুটিত-চিত্তে তোমাকে আহ্বান করিতেছি, মা! আইস, দুর্গতিনাশিনি, আমার এই অসীম দুর্গতি নাশ করিতে আইস। আইস, জ্ঞানময়ি, আমার নয়ন হইতে এই গভীর অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করিতে আইস। শক্তি-স্বরূপিণি, আমার এই দুর্ব্বল বাহুতে তোমার ঐ অলজ্ঘ্য বীর্য্য সঞ্চার করিতে আইস।

হাঁ মা, তুমি গিয়াছিলে কোথায় যে আজ বাঙ্গালার চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিয়া আসিবার জন্য তোমাকে ভক্তিভরে আহ্বান করিতেছি? হাঁ মা, তুমি গিয়াছিলে কোথায় যে

শরতে শ্রীশ্রীশারদা।

আজ আমার হৃদয়-মণ্ডপে ফিরিয়া আসিবার জন্য কাতরে তোমাকে আহ্বান করিতেছি? তুমি যে নিত্যা,—তুমি আর যাইবেই বা কোথায়? তুমি যে জগন্মূর্ত্তি। এই বিচিত্র বিশ্বের রচনা তুমিই করিয়াছ, এই বিচিত্র বিশ্ব তুমিই রক্ষা করিতেছ, তুমিই আবার এই বিচিত্র বিশ্বের ধ্বংস সাধন করিতেছে। তুমি কি বিশ্বের শুধু রচয়িত্রী, শুধু পালন-কর্ত্রী, শুধু ধ্বংসকর্ত্রী? তুমি ত বিশ্বের শুধু রচয়িত্রী নহ; তুমি ত বিশ্বের শুধু পালনকর্ত্রী নহ; তুমি ত বিশ্বের শুধু ধ্বংসকর্ত্রী নহ;—তুমিই এই বিশ্ব। জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, নীল নভোনীলে তুমি; জল, স্থল, অনল, অনিল, নীল নভোনীলই তুমি। তবে তুমি, মা, আর যাইবেই বা কোথায়? আর আসিবেই বা কোথায়? যাহার নীরব আহ্বানে পাগল হইয়া প্রেমিক অভ্রভেদী গিরি লঙ্ঘন করিয়া ধাবিত হইতেছে, উত্তাল-তরঙ্গ জলধি সাঁতারিয়া পার হইতেছে সেই রমণীয়-দর্শন আমার চৈতন্যই যে তুমি। আবার যাহার অপূর্ব্ব কুহকে অন্ধ হইয়া আমার হৃদয়-বিহারী সেই সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ চৈতন্যকে আমি দেখিতে পাইতেছি না আমার সেই মোহও যে তুমি। যে আমাকে তাহার আদর আহ্বানে আকুল করে সেও তুমি; আবার যে তাহার কুহক হাসিতে আমাকে তোমার পথ ভুলাইয়া দেয়, সেও

তুমি। তুমি যে আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছ, জননি। তবে আর তুমি যাইবেই বা কোথায়, আর আসিবেই বা কোথায়? যাহার তাড়নায় আমি তোমা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি আমার সে বৃত্তিও তুমি। আবার যাহার শাসনে আমি তোমার পথে ফিরিতেছি আমার সে বুদ্ধিও যে তুমি। যে ক্ষুধার জ্বালায় আমি সত্যের সুন্দর পথ পরিত্যাগ করিয়া অসত্যের আপাতমধুর পথ ধরিতেছি আমার সে রাক্ষসী ক্ষুধাও তুমি। আবার যাহার প্রভাবে অনৃতের আপাতমধুর পথ অবহেলা করিয়া ঋতের আপাত-বিরস পথে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইতেছি আমার সে তুষ্টিও যে তুমি। যাহার প্রভাবে আমি তোমাকে বিস্মৃত হই আমার সেই ভ্রান্তিও তুমি; আবার যাহার প্রভাবে তোমার কথা মনে জাগে আমার সে স্মৃতিও যে তুমি। তুমিই আমার সুপ্তি; তুমিই আমার জাগরণ। তুমিই আমার বাহুতে শক্তি; তুমিই আমার হৃদয়ে ভক্তি। বাহিরে, জল, স্থল, অনল, অনিল, নীল নভোনীল,—সকলই তুমি। ভিতরে, চৈতন্য-মোহ, ভ্রান্তি-স্মৃতি, তৃষ্ণা-তুষ্টি, বৃত্তি-বুদ্ধি, ভক্তি-মুক্তি,—সকলই তুমি। তুমি সদা সর্ব্বত্র আমার ভিতরে ও বাহিরে।

হাঁ মা, তবে তুমি গিয়াছিলে কোথায় যে আজি আবার

ফিরিয়া আসিবার জন্য এমন করিয়া তোমাকে ডাকিতেছি। হাঁ, তুমি নিত্যা, তুমি জগন্মূর্ত্তি; তবুও তুমি কিন্তু আসিয়া থাক, তবুও তুমি কিন্তু যাইয়া থাক। এই নিত্যা-জগন্মূর্ত্তি তোমার যে আবির্ভাব-তিরোধান সে এক মধুময়-আনন্দ-রহস্য। তুমি নিত্যা, তবু তুমি আসিয়া থাক; তুমি নিত্যা, তবু তুমি যাইয়া থাক। তুমি জগন্মূর্ত্তি, তবু তুমি রূপ-নামের দেহে আসিয়া থাক; তুমি জগন্মূর্ত্তি, তাই তুমি কর্ম্মশেষে রূপ-নামের দেহ ত্যাগ করিয়া তোমার জগন্মূর্ত্তির মধ্যে ফিরিয়া যাইয়া থাক। তুমি যে স্নেহময়ী জগজ্জননী, তোমার যে সন্তান ভক্তিভরে তোমার পূজা করে তুমি তাহার সাধ পূর্ণ করিতে যে রূপ নাম পরিয়া আসিয়া থাক, জননি। অসুর-নিপীড়িত-দেবগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তুমি যে রূপ নাম লইয়া আসিয়াছিলে। সেদিন তোমার সুগৌর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, কম্বুকণ্ঠে কণ্ঠাভরণ, কর্ণ-যুগলে কুণ্ডলযুগল, সুচারু বাহুতে কেয়ূর-বলয়, রাজীব-চরণে সুন্দর নূপুর, চম্পকাঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয়ক, পীনোন্নত-পয়োধর-বক্ষে অম্লান পঙ্কজমালা। তোমার ভুজে সেদিন যমদত্ত খড়্গ-চর্ম্ম, বরুণ-নারায়ণ-দত্ত শঙ্খচক্র, বায়ুদত্ত ধনু-তূণীর, মহাদেবদত্ত শূল, দেবেন্দ্রদত্ত বজ্র। তোমার বাহন সেদিন পশুরাজ কেশরী। সেই ত তুমি আসিয়াছিলে;

নির্ম্মাল্য।

সেই ত তুমি অসুরনাশান্তে চলিয়া গিয়াছিলে। তাহার পর আরও কতবার আসিয়াছ, আরও কতবার চলিয়া গিয়াছ। তোমার অচিন্ত্য লীলা,—তুমি নিত্যা-জগন্মূর্ত্তি হইয়াও ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য দেবীরূপে সুর-নর-নয়ন-গোচর হইয়া থাক। এই শারদ প্রভাতের তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণে যাঁহার আশু-আগমন-চিহ্ন পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছি তিনি এই রূপ-নাম-ময়ী জননী আমার। কাহার আসার আশায় পুলকিত হইতেছি এই শারদ প্রভাতে? নিত্যার আসার আশায় নহে, জগন্মূর্ত্তির আসার আশায় নহে, এমন কি রূপনাম-ময়ী জননীর নব আবির্ভাবের আশায়ও নহে। আমি পুলকিত হইতেছি রাজরাজেশ্বরীর আশু আসার আশায়। সেই যে আসিয়াছিলে,—ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, কর্ণে কুণ্ডল, চরণে নূপুর, কণ্ঠে অম্লান পঙ্কজমালা, ভুজে অসি চর্ম্ম শঙ্খ চক্র শূল সর্প, পদতলে কেশরী, উত্তম অসুর বধে। বাঙ্গালী রাজরাজমোহিনীর সেই অপরূপ আবির্ভাব ভক্তিভরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। প্রতিবৎসর শরতে কাষ্ঠে-তৃণে, মৃত্তিকায়-রঙ্গে সে সেই রাজরাজমোহিনীর রমণীয় মূর্ত্তি গঠিত করিয়া পূজা করে। নিত্যা-জগন্মূর্ত্তি জননী আসিয়া ভক্তি-রচিতা সেই প্রতিমায় প্রাণ সঞ্চার করেন। বর্ষপরে, প্রতি শরতে যে

শরতে শ্রীশ্রীশারদা।

দেবী তাঁহার এই প্রতিমায় বঙ্গদেশে আইসেন, আজ এই শারদ প্রভাতের তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণে সেই মৃণ্ময়ী জননীর আগমন-রেখা দেখিতেছি তাই আনন্দে উল্লসিত হইতেছি।

আইস, তবে, বঙ্গের শারদীয়া পূজা ;—আইস, তবে, বঙ্গের চণ্ডীমণ্ডপে, বঙ্গেশ্বরি ; আইস আমার হৃদয়পুরে, হৃদয়ানন্দদায়িনি। তুমি নিত্যা,—আমি বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি, কিন্তু আঁখিতে ধরিতে পারি না, জননি। তুমি জগন্মূর্ত্তি,—আমি বিচারে বুঝিতে পারি, কিন্তু ব্যবহারে ধরিতে পারি না, মা। তুমি আবির্ভূতা হইয়া থাক,—আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তোমার রূপ-নাম-ময়ী মূর্ত্তি আমি চক্ষে দেখি নাই, জননি। তাই আমি বরণ করিয়া লইয়াছি তোমার রূপ-নাম-ময়ী মূর্ত্তির এই পরমরমণীয় মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি। আমার পিতাপিতামহ তোমার এই রাজ-রাজেশ্বরী, মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি ভক্তিভরে তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপে স্থাপিত করিয়া ভক্তি-আসারে তোমার সুর-নর-বন্দ্য চরণ ধৌত করিয়া সহস্রোৎপলে পূজা করিতেন। আমি আবাল্য তোমার এই রাজরাজমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া কত সুখস্বপ্ন রচনা করিতেছি। তোমার এই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি আমার অন্তরে অন্তরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তোমার সকলই

আমার অত্যন্ত প্রিয়। শারদ প্রভাতের তরুণ-অরুণ-হিরণ-কিরণ তোমার রূপ মাখিয়া আইসে তাই সে কিরণ আমার এত আদরের। তুমি যে মাসে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ উজ্জ্বল করিতে শুভাগমন কর সে মাস আমার পরম শ্রদ্ধার মাস। তুমি যে কয়েকদিন আমাদের বাটীতে অবস্থিতি কর সে কয়েকদিন আমার পরমানন্দের দিন। যখন পূত ধূপামোদে তোমার আরতি হইতে থাকে তখন তোমার যে গল-গল-ছল-ছল ভাব, সে ভাবে আমি তোমার আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তিভরে গলদশ্রুনয়নে তোমার শ্রীমুখে চাহিয়া থাকি, আমার প্রাণ পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়া যায়।

তবে আইস, আমার পিতাপিতামহের আরাধ্য ধন, আমার পিতাপিতামহের এই সাধের চণ্ডীমণ্ডপে আইস। চণ্ডীমণ্ডপ জীর্ণ,ভগ্ন। তাহাতে কি ? তুমি আসিলেই তোমার শ্রীচরণস্পর্শে এই জীর্ণ ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপ সুবর্ণ-মণ্ডপ হইয়া যাইবে। তবে আইস, আমার স্মৃতিস্বপ্নবিজড়িতা পরমারাধ্যা জননী আমার এই হৃদয়মণ্ডপে আইস। হৃদয়মণ্ডপ ধূলি-মাটি-মলা-মাখা। তাহাতে কি ? তুমি আসিলেই তোমার মঙ্গলচরণস্পর্শে মলিনহৃদয় নির্ম্মল হইয়া যাইবে। তোমার এই চণ্ডীমণ্ডপ-আলোকরা-রূপ আমি ভালবাসি। প্রাচীন বঙ্গের এই জীর্ণ, পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপে তোমার ঐ

শরতে শ্রীশ্রীশারদা।

'দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার-মকরন্দ-কণারুণ' চরণ জড়াইয়া আমি এই ধূলিশয়নে পড়িয়া রহিলাম, জননি! তুমি আইস তোমার এই রমণীয় মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি মাঝে, তুমি আইস তোমার ঐ বিচিত্রবৈভব সাজে, তুমি আইস তোমার এই চণ্ডীমণ্ডপে, তুমি আইস তোমার এই হৃদয়মণ্ডপে। তুমি প্রসন্না হইলে তোমার ঐ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ী হইয়া উঠিবে। তুমি প্রসন্না হইলে ঐ কেশরি-কেশর চরণে চাপিয়া তুমি বিমলহাসে উপস্থিত হইবে। তুমি প্রসন্না হইলে তোমার ঐ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতেই তোমার জগন্ময়ী মূর্ত্তি দেখাইবে। তুমি প্রসন্না হইলে তোমার নিত্যা প্রকৃতি নিরস্ত-সন্দেহ করিয়া অনুভব করাইয়া দিবে। জননি, তুমি নিত্যা, তুমি জগন্মূর্ত্তি, তুমি অবতার, তুমিই আবার মৃণ্ময়ী। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ-সেবিতা আমার আবাল্য-আরাধিতা তোমার এই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির পবিত্র চরণ চাহিয়া আমি বঙ্গের এই পুরাতন চণ্ডী-মণ্ডপে পড়িয়া রহিলাম। তোমার দয়া হয়, কেশরীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, অম্লান পঙ্কজমালা পরিয়া তোমার অবতার মূর্ত্তি দেখাইও। তোমার দয়া হয়, জলে স্থলে, অনলে অনিলে তোমার জগন্মূর্ত্তি দেখাইও। তোমার দয়া হয়, তবে নিত্যা প্রকৃতি সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাসাইও। আমি এক্ষণে তোমার এই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি প্রাণে পাইয়াই পরম সুখী।

মধু, মধু, মা আসিয়াছেন বর্ষপরে তাঁহার বাসগৃহে! মধু, মধু, মা আসিয়াছেন বর্ষপরে তাঁহার হৃদয়গৃহে! জীর্ণ, ভগ্ন, প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপে আমি এই পড়িয়া রহিলাম।

আইস, বঙ্গের হাসিমুখ বালক বালিকাগণ, মায়ের এই শ্রীমূর্ত্তি বেড়িয়া বেড়িয়া উল্লাসে, উৎফুল্ল নয়নে তোল তান— "কেমন করে পরের ঘরে ছিলি, উমা; বল্ মা তাই।" আমি তোমাদের এই চণ্ডীমণ্ডপের একপার্শ্বে ধূলিশয়নে পড়িয়া আছি। তোমরা গাহিয়া গাহিয়া যখন মাতৃমূর্ত্তি বেষ্টন করিবে তখন আমার অঙ্গে তোমাদের চরণের ধূলি লাগিতে দিও। আইস, ভাই সানাইদার, আমি তোমার চণ্ডীমণ্ডপের একধারে এই ধূলিশয়নে পড়িয়া আছি। তুমি যখন তোমার মধুস্বরে ডাকিবে "গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, ঐ এল ঈশানি, তোর পাষাণী" —তখন তোমার সেই ভক্তিপূর্ণ রূপরঞ্জিত মুখে একবার আমার দিকে চাহিও। আইস, ভাই কর্ম্মকার, তোমার চণ্ডীমণ্ডপের একপার্শ্বে পড়িয়া অনেকদিন আমি তোমার বলিদান দেখিয়া আসিতেছি। আজি গ্রহণ কর অঞ্জলি ভরিয়া ঐ চরণামৃত, আজি পরিধান কর কর্ণে ঐ নির্ম্মাল্য, জানু পাত ঐ যূপপার্শ্বে স্থিরলক্ষ্য হইয়া; তোমার ঐ যূপে আমার এই মহিষ ধরিয়া দিতেছি, দাও ইহাকে তোমার

শরতে শ্রীশ্রীশারদা।

ঐ শাণিত খড়্গে বলি। বাজাও, ভাই ঢাকি, তোমার ঐ মধুর ঢাকে বলির বিপুল বাজনা, উঠুক্ সে বাদ্যের রোল বঙ্গের এই চণ্ডীমণ্ডপে, ভাসাক্ সে বাদ্যোদ্যম বাঙ্গালার গগনপবন। আমি পড়িয়া আছি এই তোমার প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপে। আসুন পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়, আমি আপনার এই পবিত্র চণ্ডীমণ্ডপের একপার্শ্বে ধূলিশয়নে পড়িয়া আছি। বড় সাধ শুনিব আপনার মুখে আবার সেই জ্ঞান-গান—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

বড় সাধ শুনিব শ্রীমুখে সেই সুমধুর প্রেমগান—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

সৌরকরে অশ্বত্থ-পত্র।

বেলা প্রায় এক প্রহর সময়ে সে যখন বাহিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া চাহিল, তখন দেখিল সবুজদুর্ব্বাদলোপরি গৈরিক বসন ও সামুদ্রিক নারিকেল-মালার কমণ্ডলু। বুঝিল, আজি এই প্রভাতে সাধু আসিয়াছেন। সে দিন আসিয়াছিলেন একজন,—শিরে দীর্ঘ জটাভার, দেহে বিভূতি-বিলেপন, নয়নে লোহিত রাগ, প্রাণে আশ্রমনির্ম্মাণ-বাসনা। তিনি যে আসিয়াছিলেন প্রাণে তাহার ক্ষীণ রেখাও ছিল না, আজি এই গৈরিক বসন ও কমণ্ডলু দেখিয়া মনে জাগিল তাঁহার আগমন-স্মৃতি। তিনি যে প্রায় একদিন এস্থানে ছিলেন, দয়া করিয়া সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আশ্রম-নির্ম্মাণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর, সে কথাও আর কিছু মনে ছিল না। এমনই বিফলে গিয়াছিল সেই দিনটি। আজি আবার সাধু আসিয়াছেন,—দিনটি কি আজি আবার বিফলে যাইবে? এ'কথা গৈরিক ও কমণ্ডলু দেখিয়া মনে উঠিল না। হিন্দুর রক্ত যাহার ধমনীতে প্রবাহিত, গৈরিক ও কমণ্ডলুর প্রতি এক প্রগাঢ় আকর্ষণ তাহার জন্মাবধি। সাধুকে সে সাধিয়া ধরিল। সাধুর বাক্-

সংযম ও শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া, তাহার আগ্রহ জাগিয়া উঠিল, —সে যাহা অনুসন্ধান করিয়া ফিরে, ভাবিল—বুঝি তাহা এই সৌম্যমূর্ত্তির অভ্যন্তরে মিলিতে পারে। আশা ও আকাঙ্ক্ষায় বহুবার বহু সাধু সন্ন্যাসীর চরণ সে ধরিয়াছে, আজি আবার আশা ও আকাঙ্ক্ষায় চরণ ধরিল। সাধু আসন পাতিলেন তরুতলে, সুরম্য হর্ম্ম্যে উঠিলেন না,—সম্মুখ করিলেন বনের দিকে, পশ্চাৎ রাখিলেন অট্টালিকার প্রতি। তাহার পর তাঁহার সেবায় বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। দারুণ গ্রীষ্মের অগ্নিসম প্রখর সূর্য্যকরে যখন মুখ ঝলসিয়া যাইতে লাগিল, তখন সাধুকে পুনরায় সে গৃহে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিল। মৃদুস্বরে সাধু বলিলেন, "যাহা ত্যাগ করিয়াছি তাহার মধ্যে আর প্রবেশ করিব না"। তাহার পর সেই রৌদ্রে পুড়িয়া পুড়িয়া সারাদিন অনেক কথা হইল। প্রাণায়াম, যোগ, পরমাত্মা। সাধুর কথার ছন্দে বেশ একটু রস ও ভাব ছিল। বিশেষ আগ্রহের সহিত সে শুনিতেছিল। দূরে, চতুষ্পার্শ্বে, বাটের সিকতায় ও মাঠের শস্যশিরে অগ্নিসম রবিকরে মরীচিকার তরঙ্গ সমূহ তর্ তর্ করিয়া ভাসিতেছিল। জলভ্রমে তৃষাতুর মৃগ যেমন মরীচিকার প্রতি ধাবিত হয়, সে তেমনই তৃষাতুর প্রাণে সাধুর হৃদয়ের প্রতি ছুটিতেছিল।

নির্ম্মাল্য।

পশ্চিম গগনে সূর্য্যদেব যখন ঢলিয়া পড়িলেন, মাঠের ও বাটের মরীচিকা তখন মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মরীচিকা তখন ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে ও লহরে লহরে ছুটিতেছে—সাধু অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন,—গভীর নিশীথে প্রণয়ের সুখ-সম্ভাষণ হইবে। অন্যদিন কক্ষের অভ্যন্তরে বসিয়া থাকিলেও নিদাঘের দাবদাহ প্রশমিত হয় না। আজ প্রচণ্ড রবিকরে দগ্ধ হইয়াও জ্বালা নাই, আশার কুহকে এমনই অঘটন ঘটে। রাত্রি হইয়াছে। সাধুর স্নান হইয়া গিয়াছে, সায়ংকৃত্য হইয়া গিয়াছে, সেবা হইয়া গিয়াছে। সে আশায় আশায় আছে। আর একটু পরেই ত শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে। ঐ যে আকাশে বসন্তের শুক্লাচতুর্দ্দশীর চন্দ্রমা হাসিতেছে, ঐ যে কৌমুদীর রজতধারায় বসুধা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, ঐ যে মৃদু সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনই ত জগৎ নীরব হইয়া যাইবে। আবেগ চরমে চড়িল। তাহার পর চতুর্দ্দিক শান্ত হইয়া গেল। পবন-সঞ্চালনে ক্বচিৎ বৃন্তচ্যুত আম্রফলের পতনশব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ ত নাই। সকলেই ত ঘুমাইয়াছে। তবে আর বিলম্ব কেন? জাগ্রৎ ত শুধু চন্দ্র ও তারকা। উহারা ত অন্তরঙ্গ। উহাদের সম্মুখে প্রাণের দ্বার খুলিতে আর দোষ কি? সাগ্রহে সে ডাকিল "বাবা উঠুন, সময়

হইয়াছে।” সাড়া মিলিল না। সে ভাবিল, বাবা সমাহিত আছেন। তাহার পর কতক্ষণ কাটিয়া গেল। ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া, সে আবার ডাকিল “বাবা”। কোনও সাড়া নাই। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনে হইল গুরু ভোজনের পর সাধুর গভীর নিদ্রা আসিয়াছে। কুহকিনী আশা কহিল, “এখনই উঠিবেন”। তিনি যে বলিয়াছেন—‘গভীর রজনীতে—’। সে বসিয়া রহিল। আকাশে চন্দ্র, তারকা, আর বৃক্ষতলে সে,—তাহারাই শুধু জাগিয়া আছে, নিদ্রিত আর সকলেই। রাত্রি বাড়িয়া গেল। তাহার প্রাণের মরীচিকা কাঁপিয়া কাঁপিয়া যেন মিলাইতে আরম্ভ করিল। হতাশে ডাকিল “বাবা! বাবা!!” ঘুমের ঘোরে “হুঁ—উঁ” করিয়া শব্দ করিয়া সাধু নীরব হইলেন। তাহার পর আরও কিছুক্ষণ সে বসিয়া রহিল, শেষে বুঝিল এমন জ্যোৎস্নাস্নাত দূর্ব্বাদল-শয্যায় গুরুভোজনান্তে সাধুর যে নিদ্রা আসিয়াছে সে নিদ্রা আর আজ রজনীতে ভাঙ্গিবার আশা কম। ধীরে ধীরে তরুতল ছাড়িয়া নিশাশেষে সে তাহার শয্যায় অবসন্ন দেহ ঢালিয়া দিল। তখনও মৃগতৃষ্ণিকার লহর তাহার হৃদয়ে দুলিতেছিল—সাধু হয়ত রাত্রিতে জাগরিত হইয়া তাহাকে ডাকিবেন এবং প্রতিশ্রুত প্রণয়-সম্ভাষণ করিবেন।

প্রভাতের শীতল বায়ু যখন বহিল, আলোকের রেখা

পূর্ব্বাকাশে যখন ফুটিয়া উঠিল, তখন সে আর বাহিরে আসিল না। বাহিরের লোকের নিকট ছুটাছুটি বৃথা, অমূল্য সময় এমন ভাবে না কাটাইয়া আপন অন্তঃপুরে ইঙ্গিতের সন্ধান করিলে মঙ্গল হইবে—এমনই একটা ভাবের ছায়ায় তখন তাহার প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিল নিদ্রান্তে সাধু কম্বলোপরি উঠিয়া বসিয়াছেন ; পার্শ্বে গৈরিক ও কমণ্ডলু। প্রভাতের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই তাঁহার নিকট রহিয়াছে দেখিয়া সে আর বাহিরে আসিল না। হস্তমুখাদিপ্রক্ষালনান্তর উন্মুক্ত-বাতায়নপার্শ্বে উপবেশন করিয়া হতাশ প্রাণে শান্তি আনিবার জন্য অল্প যত্ন করিতে না করিতেই প্রাণ স্থির হইয়া আসিল, ধীরশ্বাসে জপ চলিতে লাগিল। সাধু একাকী তরুতলে ভাবিয়া, হঠাৎ মন ব্যস্ত হইল। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিল—সাধু স্নানাদি সারিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিয়া উপবিষ্ট আছেন। শান্ত প্রাণ-প্রবাহ শান্ত রাখিয়াই তরুতলে আসিয়া সে অগ্নি জ্বালিয়া দিল। সাধু তাঁহার প্রাতঃকৃত্যের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সে ধীরে ধীরে আসিয়া তরুপার্শ্বের পরিষ্কৃত পথে দাঁড়াইল। নয়ন তুলিয়া চাহিতে দেখিল—সম্মুখের অশ্বত্থবৃক্ষের শাখায় প্রভাত-পবনে পত্রপুঞ্জ নাচিতেছে। বসন্তের পত্রের রমণীয় কান্তি,

সৌরকরে অশ্বত্থ-পত্র।

—সুপুষ্ট, শ্যাম, সতেজ। কোথায়ও দাগ নাই,—কলঙ্কের ক্ষীণ লেখাও নাই। পবনহিল্লোলে দুলিতেছে, না আপন পবিত্র প্রাণের সরলতায় খেলিতেছে। আর সেই পূত পত্রে পূত সৌরকর। এখনও রৌদ্রের তেজ হয় নাই। যেমন বালপত্র, তেমনই বালসূর্য্য; যেমন পত্রের কচি দেহ, তেমনই বালার্কের কচি কিরণ। নধরে নধরে, পবিত্রতায় পবিত্রতায় অপূর্ব্ব বিজড়ন। তাহার প্রাণের অবসাদ টুটিয়া গেল, তাহার প্রাণ ঐ অশ্বত্থবৃক্ষের শাখায় চড়িল, তাহার বৃন্ত হইল,—বৃন্ত হইতে সে পত্র হইল, তাহার গাত্রে পত্রের শতশিরা ফুটিয়া উঠিল, তাহার দীর্ঘ পত্রপুচ্ছ হইল, সে অশ্বত্থপত্রের মাঝে এক অশ্বত্থপত্র। অশ্বত্থ-শাখায় প্রভাত-পবনে অপূর্ব্বপত্র দুলিতে লাগিল। কোথায়ও অপবিত্রতা নাই,—শুভ্র, পূত, পরম পবিত্র। কচি কিসলয়ে কচি কিরণ আসিয়া পড়িল। কচি পত্র কচি কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—সংস্কার-চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গেল। অব্যক্ত আনন্দে বালার্ক-কিরণে সে অশ্বত্থশাখায় পত্ররূপে দুলিতে দুলিতে পরম শান্তি লাভ করিল। সাধুর সাহচর্য্যে যাহা ঘটিল না, আজি এই প্রভাতে সৌরকরে অশ্বত্থপত্রে তাহা ঘটিল। কে বলিতে পারে, কখন্ কোন্‌ভাবে তিনি তাঁহার কৃপাস্পর্শে তৃষিতপ্রাণ শীতল করেন! এমনই করিয়া

নির্ম্মাল্য।

দশবৎসর পূর্ব্বে, এমন করিয়া চারি বৎসর পূর্ব্বে, এমনই করিয়া আজি আবার—!!



কুহুতানে।

সার্দ্ধ-প্রহর রজনীতে পরিবারের সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িল, দিবসের শারীরিক পরিশ্রমে শ্রান্ত দাস দাসী যখন শয্যায় ঢলিয়া পড়িল, সে তখন হস্তপদাদি প্রক্ষালিত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—যে যাহার শয্যায় ঘুমঘোরে হতচেতন। কোথায়ও কেহ তাহার গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার নাই। সে যেন এই গভীর রজনীতে গোপনে কি করিবে। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে কক্ষের বাতায়নগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিল। উন্মুক্ত-বাতায়ন-পথে বেশ করিয়া বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল,—কেহ কোথায়ও নাই। তখন সে নাত্যুচ্চ পর্য্যঙ্কে বিশেষ আদরে দুগ্ধফেননিভ শয্যা রচনা করিল। ধীরে, নিঃশব্দে পর্ণ-পেটিকা খুলিল। পেটিকার মধ্য হইতে স্নিগ্ধ-গন্ধ আতরের ক্ষুদ্র শিশিটি বাহির করিল। তাহার পর একখানি সূক্ষ্ম, চিক্কণ রুমাল বাহির করিল। চিক্কণ রুমালে সুরভি আতর ছড়াইয়া দিল। সৌরভসিক্ত রুমালখানি পরম আদরভরে শয্যার অঙ্গে আপাদমস্তক বুলাইয়া দিল। সৌরভে কক্ষ পরিপূর্ণ হইল। তাহার পর সুরভিত শয্যায় আসিয়া

উপাধানে দেহ ঈষৎ আনত ভাবে ঢালিয়া সে যেন একটু আরাম করিয়া লইল। ক্ষণকাল পরে ধীরহস্তে কবাটের অর্গল উন্মোচন করিল। উন্মুক্ত দ্বারপথে, ধীর পদক্ষেপে, সকলের অজ্ঞাতসারে, সে কক্ষ হইতে প্রাঙ্গণে নামিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—শুক্লা দশমীর শুভ্র জ্যোৎস্না আকাশ ভাসাইয়া, বৃক্ষের সবুজ পত্ররাশি উজ্জ্বল করিয়া শ্যামদূর্ব্বাদল আলিঙ্গন-পূর্ব্বক আবেশে পড়িয়া আছে। তাহার প্রাণের মাঝে ব্যাকুল বাসনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যাহার আসার আশায় তাহার এই নৈশ মিলন-আয়োজন, সে কি এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে এই জ্যোৎস্নার ন্যায় আসিয়া এই দূর্ব্বাদলের ন্যায় তাহাকে আবেশে আজ আলিঙ্গন করিবে, না এ মধু যামিনী তাহার আজি বৃথায় যাইবে! সে যে অদ্ভুত প্রকৃতির লোক,—কভু আসে, কভু আসে না। যখন প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় প্রাণ পাগল হইয়া যায় তখন হয়ত আসিল না। আবার যখন হয়ত অন্য কর্ম্মে বিশেষ ব্যস্ত, তখন হঠাৎ আসিয়া মুখের প্রতি প্রেমভরে চাহিয়া আকুল করিয়া তুলিল,—হাতের কাজ হাতে আট্‌কাইয়া গেল, চখে চখে বাঁধা পড়িল! আজ কি সে আসিবে, না এমনই করিয়া বঞ্চনা করিবে? এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে চাহিয়া চাহিয়া শুভ্রজ্যোৎস্না-

পুলকিত দূর্ব্বাদল দেখিল, চাহিয়া চাহিয়া শুভ্রজ্যোৎস্না-পরিস্নাত তরুরাজি দেখিল। তাহার পর নয়ন তুলিয়া নভোমণ্ডলে চাহিল। নীল আকাশে রজতকিরণ চাঁদ হাসিতেছে, হাস্যময় চন্দ্রের পার্শ্বে পার্শ্বে, একটু দূরে দূরে, আহ্লাদে আমোদে নীল তারকা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার হৃদয়চাঁদ কি এই রজনীতে তাহার হৃদয়াকাশে উদিত হইবেন, না সে হৃদয়গগন আজ এই চন্দ্রিকাময়ী রজনীতে আঁধারাবৃত রহিবে? সে যে বিচিত্র লোক,—যেমন আদর করিতে জানে তেমনই আবার পোড়াইতে জানে! আজ তাহার কি অভিপ্রায় কে জানে! আজ কি সে জ্বালাইবে, না জুড়াইবে? আকাশ হইতে আঁখি ফিরাইয়া সে আবার ভূমিতলে চাহিল। মধুর কুসুম-কাননে চন্দ্রিকাপ্লুত ফুল্ল কুসুম লইয়া ধীর সমীর সোহাগে খেলিতেছে। কুসুম-সুন্দরী সোহাগে আদরে কখনও ঢলিয়া পড়িতেছে, আবার শির তুলিয়া অনিমিখনয়নে চাহিয়া দেখিতেছে, সে কোথায় গেল। সমীরণ ছুটিয়া আসিতেছে, আদর করিতেছে; কুসুমসুন্দরী সোহাগে সোহাগে আবার ঢলিয়া পড়িতেছে। তাহার প্রাণের মাঝে আকুল ক্রন্দন ছুটিল, সে কি এমনই করিয়া আজ তাহাকে নাচাইবে, না আজ তাহাকে কাঁদাইবে?

তৃণে জ্যোৎস্নায়, পত্রে চন্দ্রিকায়, অম্বরে সুধাকরে, কুসুমে সমীরণে এই সুখ-সম্মিলন দেখিয়া সে উন্মত্তের ন্যায় হইল। প্রাণ অবশ হইয়া উঠিল; গভীর বেদনা বক্ষে গুমরিতে লাগিল। অতিধীরপদসঞ্চারে সে আসিয়া তাহার শয্যায় ঢলিয়া পড়িল। কক্ষ নীরব, প্রাঙ্গণ নীরব, চতুর্দ্দিক নীরব। সুপ্ত তরু, সুপ্ত লতা, সুপ্ত জন, সুপ্ত বসুধা, জাগ্রৎ শুধু সে। উন্মুক্ত দ্বার, উন্মুক্ত বাতায়ন, উন্মুক্ত হৃদয়, কিন্তু সে আসিল কৈ! এখনই হয়ত কেহ জাগিয়া উঠিবে,—তাহা হইলেই ত সকলই নষ্ট হইবে, তাহা হইলেই ত সকল আয়োজন লুকাইয়া ফেলিতে হইবে! অভিমানে তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুধারা বহিল, গণ্ড তিতিল, উপাধান তিতিল। এক পরম শান্ত ভাবে, এক সুগভীর পবিত্রতায় তাহার দেহমন ভরিয়া গেল,—সে এক অনির্ব্বচনীয় আবেশে অর্দ্ধ অচেতনবৎ। ঠিক এমনই ক্ষণে বাতায়ন-পার্শ্বের চূতপত্রপুঞ্জ মাঝে কোকিল গাহিল "কু—হু"। একবার কুহরিয়া সে নীরব হইল। তাহার পর তাহার মধু স্বর যখন দিগন্তে মিলাইয়া গেল তখন আবার সে ডাকিল "কু—হু"। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে তরঙ্গ তুলিয়া বায়ু-সাগরে ছাড়িয়া দিয়া সে যেন তাহার তাল অনুভব করিবে বলিয়া নীরবে শাখিশাখায় দুলিতে লাগিল। যখন বায়ু-সাগরে

কুহুতানে।

স্বরতরঙ্গের শেষ তাল ভাসিয়া গেল সে তখন আবার রঙ্গ-ভরে মর্ম্মস্থল হইতে মাধুর্য্য বাহির করিয়া বায়ু-সাগরে ঢালিয়া দিল "কু—হু"। যে শয্যায় হতচেতনবৎ পড়িয়া-ছিল সে যেন কাহার আগমনের সাড়া পাইল,—চকিতে শয্যায় উঠিয়া বসিল, আবেশে নয়ন মুদিত করিল। আবার ঢেউ তুলিয়া, গলা টানিয়া চূতপত্রান্তরালে বসন্ত-সখা এমনই সময়ে গাহিল "কু—হু"। সোহাগ-শয্যায় প্রণয়ীর প্রাণবায়ু ছন্দে ছন্দে নাচিতে লাগিল। তাহার মন সজাগ হইয়া উঠিল। যাহার প্রতীক্ষায় এ রজনী-যাপন সে বুঝি ঐ আসিল। ধীরে ধীরে প্রাণ-স্পন্দন স্থির হইল। ঊর্দ্ধের আকাশ, আকাশের চাঁদ, চাঁদের জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নার পত্রালিঙ্গন, পত্রের সুখস্বপ্ন—ঐ সকলই সে ভুলিয়া গেল। ঠিক এমনই সময়ে মধু ঢালিয়া বসন্ত-বন্ধু গাহিল "কু—হু!" যাহার আসার আশায় শয্যারচনা, যাহার প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় বাসর-যাপনা—সে আসিয়া তাহার হৃদয়ে বসিল! আজি এ নিশীথে কোকিলের কুহুতানে আসিল প্রাণারাম! মধু মধু-যামিনী, বসন্ত নিশীথিনী, কৌমুদী নীরবে ঘুমাইল। পিকবধূ যেন এ শুভ মিলনের স্বাদ পাইল। এ মিলনের সে যে দূতী। সে তাহার পরম সুন্দর কৃষ্ণকায় দুলাইয়া গগন-পবন মধুময় করিয়া মর্ম্মস্থল হইতে "কু-হু"-স্বর

তুলিয়া প্রেমিকযুগলের নিকট যেন বিদায় লইয়া পত্রপুঞ্জমাঝ হইতে পক্ষ বিস্তার করিয়া জ্যোৎস্না সাগরে উড়িয়া গেল। আকাশে যে পথে সে উড়িয়া গেল সে পথে কুহুতানে সে যেন আঁকিয়া গেল :—

"প্রাণে প্রাণ পড়্‌ল ধরা,
ব'লে গেল সোনার পাখী!"

নিশীথে সঙ্গীত।

অযুত-খদ্যোত-খচিত-কৃষ্ণাঞ্চলাবৃতা, অর্ব্বুদ-তারকাবিজড়িত-কৃষ্ণকবরীশোভিতা কৃষ্ণা দশমীর নিদাঘ-নিশীথিনী আপন অপরূপ রূপে দিঙ্-মণ্ডল ভাসাইয়া তখন কি জানি কাহাকে মজাইতে মধুর মধুর হাসিতেছিল। নভোমণ্ডল তখনও চন্দ্রালোকে আলোকিত হয় নাই সত্য, চন্দ্রোদয়ের তখনও প্রায় চারি দণ্ড বাকি ছিল বটে, কিন্তু সেই সীমাশূন্য নিবিড়-কৃষ্ণগগনে অগণিত কুসুমের ন্যায় অসংখ্য তারকা বিকসিত হইয়া যে সৌন্দর্য্যের রচনা করিয়াছিল, তাহা জ্যোৎস্নামণ্ডিত গগনের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সহস্রগুণে মনোহর। রূপময়ী কৃষ্ণা যামিনীর রূপমোহে মুগ্ধা মেদিনী নীরব, নিস্পন্দ,—সর্ব্বপ্রকার স্পন্দন নিরুদ্ধ করিয়া সে মাত্র নয়নসর্ব্বস্ব হইয়া এই মহীয়সীর মহিমা অবলোকন করিতেছিল। নিশাসমীরণও স্থির হইয়া সেই রজনীর শোভা সন্দর্শন করিতেছিল। আম্র, অশ্বথ, বট ও বকুল স্পন্দহীন শাখায় প্রাসাদ-পার্শ্বে,প্রান্তর-মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

উন্মুক্ত-বাতায়ন-পথে চাহিয়া চাহিয়া, নিবিড়কৃষ্ণ গগনমণ্ডল অবলোকন করিয়া সে বাতায়ন পরিত্যাগ করিয়া কক্ষমধ্যে দূরে সরিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া পুনরায় সেই উন্মুক্ত বাতায়নে দাঁড়াইল, চাহিয়া চাহিয়া অসীম গগনের মণিমালা নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর বাতায়ন হইতে অপসৃত হইয়া গেল। আবার আসিল, আবার গবাক্ষে দাঁড়াইল, আবার বাহিরে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া বিশাল প্রান্তর, নীরব ধরণী, চিত্রার্পিতবৎ বৃক্ষাবলী অবলোকন করিল। বহুক্ষণ উন্মুক্ত গবাক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কি চিন্তা করিল,তাহার পর প্রকোষ্ঠাভ্যন্তর পরিত্যাগ করিয়া গগনতলে দুর্ব্বাদলে আসিয়া দাঁড়াইল। অনতিদূরে তাহারই স্বহস্ত-রচিত কুসুম-কাননে লতামণ্ডপের ভাস্বর পল্লবে খদ্যোতনিচয় রহিয়া রহিয়া তাহারই বহুকালের আশার আলোকের ন্যায় জ্বলিতেছিল, নিবিতেছিল।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া যুবক ধীরে ধীরে তাহার সাধের পুষ্পোদ্যানের যত্ন-রচিত লতামণ্ডপে প্রবেশ করিল এবং স্বহস্ত-নির্ম্মিত অনত্যুচ্চ বেদীতে উপবেশন করিল। তাহার মস্তকোপরি সহস্র সহস্র খদ্যোত জ্বলিতে লাগিল ও নিবিতে লাগিল। তদুপরি নভোমণ্ডলে অগণিত, উজ্জ্বল তারকা স্মেরাননে লতামণ্ডপসংলগ্ন খদ্যোতকুলের প্রতি এক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। অচিরে তাহার দেহ ও মন বাহ্য প্রকৃতির ন্যায় নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া গেল; তাহার হৃদয়ে এক মধুর সঙ্গীত প্রবেশ করিতে লাগিল।

নিশীথে সঙ্গীত।

সঙ্গীত-মুগ্ধ বনকুরঙ্গের ন্যায় সে লতামণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যানে নির্গত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে ফুল্ল কুসুমের সৌরভ আসিয়া তাহার প্রাণ সুরভিত করিয়া তুলিল। সেই মধুর সঙ্গীত সে স্ফুটতররূপে অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু কোন্ উৎস হইতে সেই সুর-সুধা ঝরিতেছিল সে তাহা অনুভব করিতে পারিল না।

বিশেষ-মনোযোগ-সহকারে সঙ্গীতের স্বরূপ অবধারণ করিবার জন্য সে বিকচ-কুসুমপার্শ্বে, দুর্ব্বাদলে উপবেশন করিল। আকাশে কাণ পাতিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে দেখিল, এক সুরসাগরে সমগ্র বসুধা ভাসিতেছে। সেই সুরে আকাশ বাজিতেছে, সেই সুরের তালে তালে তারকা নাচিতেছে, সেই সুরে কণ্ঠ মিশাইয়া কুসুম গাহিতেছে, সেই সুরের তালে তালে খদ্যোত জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে, সেই সুরে বৃক্ষ গাহিতেছে, সেই সুরে মঞ্জুহাসিনী কৃষ্ণা নিশীথিনী সুর মিলাইয়া সুখে গাহিতেছে, কিন্তু সকলই নীরবে নীরবে। নীরব অথচ অতি পরিষ্কার, পরিস্ফুট। নীরব কিন্তু অতীব মধুর। এতকাল সর্ব্বত্রব্যাপিনী এই সুমধুর সঙ্গীত-লহরীর সন্ধান পায় নাই ভাবিয়া সে বিস্মিত হইল। তাহার পর আপন হৃদয়বীণা এই অতুলনীয় সুরে চিরতরে বাঁধিবে বলিয়া

সে বীণার তারে পরমোল্লাসে ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল।

ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনে বীণার তার বাজিয়া উঠিল। হৃদয়বীণা বাজিতে লাগিল। যে সুরে সুর মিলাইয়া বীণা বাঁধিবার জন্য সাধক প্রয়াস করিতেছিল, সেই সুর সুস্পষ্ট হইলেও তাহাকে ঠিকমত ধরিবার জন্য প্রয়াস করিতে হইল। প্রথম মূর্চ্ছনাতেই বীণা করুণে কাঁদিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ বীণা শোকের সুরে বাজাইয়া বাদকের উপলব্ধি হইল যে, যে সুরে বীণা বাঁধিবার জন্য সে যত্ন করিতেছে সে সুর এখনও তাহার বীণায় বাজিতেছে না। সে বীণবক্ষে নক্ষত্রখচিত গগনমণ্ডলে অনিমিষে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বীণার তারে মনোযোগ দিল। কৃষ্ণা রজনীর উজ্জ্বল তারকায় নয়ন স্থির রাখিয়া সে বীণার তারে ঘা দিতে লাগিল। বীণা নাচিতে লাগিল.—উল্লাসের রাগিণী বাজিয়া উঠিল। উল্লা-সের সুরে কিছুক্ষণ বীণা বাজিলে বাদক বুঝিল যে, এখনও সে সুর ধরিতে পারে নাই। সে তাহার বীণা রাখিয়া দিল। চতুর্দ্দিকে চাহিল। পার্শ্বে, প্রস্ফুটিত কুসুমে নেত্র পতিত হইল। সে বীণায় পুনরায় মনঃসংযোগ করিল। আবার তারে ঝঙ্কার দিতে লাগিল। দৃষ্টি তাহার কুসুমেই নিবদ্ধ রহিল। বীণা হাসিতে লাগিল। যুবকের প্রথমে মনে

হইল যে, এইবার বীণা ঠিক বাঁধা হইয়াছে। কিন্তু অনতি-কালমধ্যে সে বুঝিল যে বীণা এখনও ঠিক বাজিতেছে না। বীণ্-বক্ষে, নীরবে নিস্তব্ধ আকাশে কাণ পাতিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শান্ত সাগরে লহরী তুলিয়া শান্তিময়ী কৃষ্ণা নিশীথিনী তারকায় ও কুসুমে সুর ছড়াইয়া বীণা বাজাইতেছিলেন। যুবক সেই সুর শুনিয়া প্রাণে সেই সুর ধরিয়া লইয়া পুনরায় তাহার হৃদয়বীণায় ঝঙ্কার দিল। বীণা সোহাগে-সোহাগে, আনন্দে-অনুরাগে, ধীরে মধুরে মধুর গীত গাহিতে লাগিল। বাজাইতে বাজাইতে গগন, তারকা, পাদপপ্রান্তর, কুসুম-খদ্যোত আর হৃদয় এক হইয়া গেল। শুধুই প্রেমের সুর বাজিতে লাগিল। সেই সুরস্রোতে দৃশ্য জগৎ ভরিয়া গেল। সেই সুর-সাগর হইতে ফুটিয়া উঠিল একখানি সুন্দর মুখ। সেই মুখে কি শান্ত শোভা, কি উজ্জ্বল আলোক! যুবকের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইল। সে অবশপ্রাণে সেই তারকাতলে, কুসুমপার্শ্বে, দুর্ব্বাদল-শয্যায় পড়িয়া রহিল। নির্ম্মল গগনে ধীরে ধীরে কৃষ্ণা দশমীর রজত চন্দ্র ভাসিয়া উঠিল।

শ্মশানে।

সুনীল, উজ্জ্বল, মধুর গগনের কোলে কোলে যেমন মাঝে মাঝে কোথা হইতে মেঘ ভাসিয়া আইসে এবং তাহার আনন্দময় নীলিমা আবৃত করিয়া ফেলে, তেমনই শান্ত, স্থির আনন্দোজ্জ্বল হৃদয়াকাশের কোলে কোলে মাঝে মাঝে কোথা হইতে কেমন এক আঁধার ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইয়া যায় এবং তাহার রমণীয়তা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,—এক অস্ফুট বেদনার গম্ভীর ভাব হৃদয়ে গুমরিতে থাকে, তাহার কৃষ্ণছায়া ললাটে, কপোলে ও নয়নে বেশ ফুটিয়া উঠে। বহু যত্নেও সে মেঘ উড়াইয়া দেওয়া যায় না, অসীম প্রয়াসেও সে অব্যক্ত বেদনা দূর করা যায় না। কি যেন ছিল,—তাহা আর নাই, বুঝি বা তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। সে যে কি তাহা ঠিক ঠিক ধরিতে পারা যায় না,—তবুও আঁধার, তবুও তাহার কৃষ্ণছায়া, তবুও বেদনা, তবুও তাহার বিষাদ। জ্যৈষ্ঠ মাসের এক প্রভাতে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ এক বেদনার অবস্থা দেখা দিল। মনে হইল প্রাতঃকৃত্যের প্রসাদে এই মেঘ এখনই সরিয়া যাইবে,—আবার এখনই হৃদয়াকাশে তাহার শোভা ফুটিয়া উঠিবে।

শ্মশানে।

হস্তমুখাদিপ্রক্ষালনানন্তর পরিষ্কৃত কক্ষে শুভ্র বসন পরিধান করিয়া চির-প্রিয় আসনে উপবেশন করিলাম। পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থ হইতে আমাকে পৃথক করিয়া ফেলিবার জন্য যত্ন করিলাম। দেখিতে চাহিলাম, শুধু আমাকে। শূন্যের অগণিত চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা হইতে আমাকে কুড়াইয়া আমাদের এই মরধামে আট্‌কাইয়া ফেলিলাম। তাহার পর বহু নদ, নদী, সাগর, পর্ব্বত, কানন, কান্তার, নগর, আলয় হইতে আমাকে ডাকিয়া আমার কক্ষে ফিরাইলাম। তাহার পর কক্ষের প্রশস্ত স্থান হইতে কুড়াইয়া আমাকে আমার অপ্রশস্ত দেহে বাঁধিলাম। নখরাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলাম। রোমে রোমে, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে রক্তপ্রবাহে চলিতে লাগিল সে। আরও কুড়াইয়া ফেলিলাম। হৃদপদ্মে মনরূপে ধরিলাম। পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। কিসের এই মেঘ? কোন্ নদ নদী সাগরের জলে ইহার জন্ম? কেন এমন অজ্ঞাতসারে আসে এ? কেন এমন করিয়া হৃদয়াকাশের আলোক আবৃত করিয়া দেয়? ইহার কি কোনও প্রতিকার আছে? না, এমনই ভাবে আলোকে-আঁধারে আশায়-নিরাশায়, সুখে-দুঃখে এই জীবন চির বিজড়িত

রহিবে? পরমানন্দে চিরস্থিরভাবে বাস কি ভাগ্যে নাই?

মেঘের কারণ ধরিবার প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হইল। মেঘের কৃষ্ণ ছায়া ও গুমরিত বেদনা অবিচ্ছিন্নরূপে বিজড়িত হইয়া এমনই এক মসিময় যবনিকা রচনা করিয়াছে যে সেই কৃষ্ণাবরণ অপসারিত করিয়া তাহার পশ্চাতে অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না। যেমন বিশাল পর্ব্বত-দেহ ভেদ করিয়া তাহার পশ্চাতের বস্তু দর্শন করিতে চর্ম্মচক্ষুঃ সক্ষম হয় না তেমনই এই আঁধার-বেদনা-বিরচিত আবরণ ভেদ করিয়া চক্ষু পরপারে যাইতে পারিল না। আবার প্রয়াস করিলাম,—যেমন কৃষ্ণ আবরণ তেমনই রহিল; শুধু আঁধার ও বেদনা। আঁধার ও বেদনায় দৃষ্টিশক্তি পরাভূত হইয়া গেল। পুনরায় যত্ন করিলাম, যেমন আঁধার তেমনই রহিল, যেমন বেদনা তেমনই রহিল। আঁধার তাহার কারণ বলিবে না, বেদনা তাহার কারণ ধরিতে দিবেনা। তাহারা যেন তাহাদের যাতনা একাকীই ভোগ করিতে চায়। তাহারা যেন কাহারও সহানুভূতি চাহে না। তাহারা যেন কাহাকেও তাহাদের হৃদয় দেখাইতে সম্মত নহে,—আপন দুঃখে আপনিই পুড়িবে, আপনিই পুড়িয়া আপনিই ভস্ম হইবে, তবুও কাহাকেও কোন কথা বলিবে

না। সে বড় দুরবস্থা,—হৃদয় আঁধারে আবৃত, অথচ আঁধারের কারণ অনুমান করা যাইতেছে না, হৃদয়ে বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া ঘুরিতেছে অথচ কিসের বেদনা ধরিতে পারা যাইতেছে না। সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া কক্ষের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম।

বাহিরে আসিতে না আসিতেই এক অপরূপ রূপ দেখিলাম। গৃহ-প্রাঙ্গণ-পার্শ্ব হইতে বিন্যস্ত নাতিক্ষুদ্র গোচারণ-ভূমিতে এক মনোহর সৌন্দর্য্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই প্রান্তরে নিত্যই গো, অশ্ব, আপন মনে ধীরে বিচরণ করে এবং আপন মনে ঘাস খায়। এই কারণে প্রান্তর সমশীর্ষ তৃণে সুসজ্জিত,—যেন কোন বিলাসী ব্যক্তি বিশেষ যত্নে যন্ত্রসহায়ে এইরূপে স্বচ্ছন্দজাত তৃণের শোভা সংসাধন করিয়াছেন। গত রজনীতে সর্ব্বক্ষণই প্রবল বেগে বৃষ্টি হইয়াছে। সেই নববর্ষাবারি-বিধৌত হইয়া তৃণরাজি মলিনতা-শূন্য হইয়াছে। আর সেই নির্ম্মল তৃণে মেঘাবৃত, অদৃশ্য সূর্য্যের স্নিগ্ধ আলোক পাত হইয়া এক সুবর্ণ শোভার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রভাতে বর্ষণ বন্ধ হইয়াছে। এখন বেশ বেলা হইয়াছে তথাপি সূর্য্যদেব দৃষ্টিগোচর হইতেছেন না। ধূসর মেঘমালায় গগন এখনও একেবারে আবৃত। জলদজাল ভেদ করিয়া সূর্য্যের

রশ্মি ধরার বক্ষে পড়িয়াছে কি না তাহা চক্ষে দেখা যাইতেছে না বটে কিন্তু ধরণী-বক্ষের এই তৃণ-রাশিতে অদৃশ্য সূর্য্যের অদৃশ্য আলোক অদৃশ্যভাবে এক মনোরম রূপের রচনা করিয়াছে। সেই রূপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে ঠিক অনুভব করা যায় না। তেমনই করিয়া সমগ্র রজনী ব্যাপিয়া যদি বর্ষণ হয়, তেমনই করিয়া প্রভাত আগমনে যদি বর্ষণ বন্ধ হয়, তেমনই করিয়া নভোমণ্ডল যদি মেঘ-মণ্ডলে সমাচ্ছন্ন থাকে, তেমনই করিয়া সহস্ররশ্মি যদি আবৃত রহেন, তেমনই করিয়া গগন-তলে যদি পল্লী-প্রান্তর বিন্যস্ত রহে, তেমনই করিয়া সমশীর্ষ, সুবিধৌত প্রান্তর-তৃণে যদি অদৃশ্য সূর্য্যের অদৃশ্য আলোক ধরা পড়ে—আর যদি কেহ একাকী দ্বার খুলিয়া প্রথমেই সেই আলোকিত প্রান্তর-তৃণে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলেই সেই রূপ অনুভব করিতে পারিবে, নহিলে সেই অপূর্ব্ব রূপ অনুমান করা দুঃসাধ্য।

সেই শোভা দেখিয়া যেন কি এক আকর্ষণে পড়িলাম। চরণ চলিতে লাগিল,—মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিতে লাগিল। আসিয়া প্রান্তরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলাম। চারিভিতে, পদতলে সেই অপূর্ব্ব রূপ। রূপের স্পর্শে নয়ন তুলিয়া চাহিতে দেখি প্রান্তর পার্শ্বের পত্রবহুল অশ্বত্থের বর্ষাবারি-বিধৌত পত্র

রাশিতে পবন-সঞ্চালনে সেই রূপ নাচিতেছে। পশ্চাৎ ফিরিতে দেখি বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের আকণ্ঠ-উচ্চ গভীর-সবুজ শস্যের সবুজপত্রসমন্বিত শীর্ষে পবন-হিল্লোলে সেই অপরূপ রূপ হিল্লোলিত হইতেছে। পদতলে, ভূতলে সেইরূপ। দূরে শস্যক্ষেত্রে সেইরূপ। ঊর্দ্ধে, অশ্বত্থ-শিরে সেইরূপ। ভূতলে স্থির, শান্ত। শস্যক্ষেত্রে তরঙ্গায়িত। তরুশিরে আন্দোলিত। একবার ভূতলে চাহি। একবার শস্যক্ষেত্রে চাহি। একবার তরুশিরে চাহি। রূপের সহিত মিশিতে মিশিতে, রূপ চক্ষের অভ্যন্তরে ধরিতে ধরিতে হৃদয়ের আঁধার সরিয়া গেল, গুমরিত বেদনা ভাসিয়া গেল। তৃণের রূপে, শস্যের রূপে, তরুর রূপে, চক্ষের রূপে বেশ মিশামিশি চলিতে লাগিল। তরুশীর্ষ হইতে ঢেউ খেলিয়া সেই রূপ শস্যশীর্ষে দুলিতে লাগিল, শস্যশীর্ষ হইতে ভাসিয়া আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে লাগিল, হৃদয় ভাসাইয়া দেহে খেলিতে লাগিল, দেহ প্লাবিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। সৌন্দর্য্য স্পর্শে হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হইল। আলোক-স্পর্শে হৃদয়ের আঁধার অপসারিত হইল। শান্ত, স্থির মন। শান্ত, স্থির প্রাণ। শান্ত, স্থির দেহ। শান্ত মনে, স্থির প্রাণে, ধীর চরণে চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে অচিরে আসিলাম

নির্ম্মাল্য।

পার্ব্বত্যনদীর তট-ভূমিতে। কাল সন্ধ্যায় আসিয়াছিলাম এই নদীপুলিনে। তখন নদীতে বিশেষ জল ছিল না। এক-প্রকার জলজ উদ্ভিদে নদীতল আবৃত ছিল। এখন নববর্ষার বারি-রাশিতে নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ। মৃদুপবন-সঞ্চালনে নদীজলে ভাসিতেছে অসংখ্য ক্ষুদ্র তরঙ্গ,—এই নববর্ষার আমোদে ঢলিতে ঢলিতে, এ উহার গাত্রে পড়িতে পড়িতে, অবিরামগতিতে চলিতেছে সংখ্যাতীত বীচি। ওকূলে শস্য-ক্ষেত্র দুলিতেছে পবন সঞ্চালনে, একূলে স্থিরভাবে শুইয়া শ্মশান।

আমি শ্মশানে আসিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখে নদীজলে তরঙ্গসনে নাচিতেছে শ্মশান-কলসী। নদীকূলে শ্মশান-তৃণগুল্মে আবদ্ধ অর্দ্ধদগ্ধ চিতাকাষ্ঠ। জলজ-উদ্ভিদ বিষকাঁটা-স্তূপে পাণিকৌড়ি তাহার কৃষ্ণদেহ স্থির করিয়া বসিয়া আছে। কি এক আকর্ষণে আরও অগ্রসর হইলাম। একেবারে, শ্মশানের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িলাম। আর এক হাত পরেই নদীজল। এক পরমসুন্দর, শ্মশান-পুষ্ট বনবদরী আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার তলদেশে গমন করিলাম। কি সুন্দর শ্মশান-তরু! ভস্মীভূত-নরদেহ-সঞ্জাত সারে তাহার কলেবর সুগঠিত। সেই সুগঠিত দেহ বর্ষাবারিবিধৌত,—কোথাও

শ্মশানে।

এক বিন্দু ময়লা নাই। মসৃণ, চিক্কণ চারু দেহ। তরুদেহ বক্ষে জড়াইয়া ধরিলাম। বক্ষ শীতল হইল। দুই হস্তে দুই শাখা ধরিয়া বনবদরী-বক্ষে বক্ষ মিশাইয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ চাহিতে দেখি চারিদিকে কঙ্কাল। কোথায়ও মস্তক, কোথায়ও হস্ত। মস্তকে কেশ নাই,—কেশশূন্য, শুভ্র শিরে জোড়ের চিহ্ন প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। যেস্থানে একদিন অভিরাম আঁখি ছিল, আজি সেই স্থানে ভীতিজনক গহ্বর। বদনবিবরে দন্তগুলি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার সে মুক্তার ন্যায় জ্যোতিঃ আর নাই। ললাট ধব্ধবে সাদা। হস্তে রক্ত মাংসের চিহ্নও নাই—ধব্ধবে সাদা। বামদিকে চাহিতে দেখি এক বিবরে সর্পের নির্ম্মোক। বোধ হইল নির্ম্মোক ত্যাগ করিতে করিতে সর্প বিবরে প্রবেশ করিয়াছে,—নির্ম্মোকের একটি অংশ বিবর-বাহিরে, অপরাংশ বিবরাভ্যন্তরে। অনতিদূরে, অন্য শ্মশান-বৃক্ষে স্থিরভাবে বসিয়া দুইটি চিল। অনিল-বিকম্পিত, গভীর-সবুজপত্র-সমন্বিত শস্যশীর্ষে অদৃশ্য সূর্য্যের আলোক-রূপ; নববর্ষা-বারিপূর্ণ-পার্ব্বত্য-প্রবাহিণী-বক্ষে প্লবমান অগণিত তরঙ্গের জলকেলির রূপ; লীলাময় তরঙ্গতাড়নে ধীরে নর্ত্তনশীল শ্মশান কলসীর সৌন্দর্য্য; প্রবাহিণীতটব্যাপী জলজ উদ্ভিদরাশির সহিত অর্দ্ধদগ্ধ

চিতাকাষ্ঠের বিজড়নের শোভা, জলজ-উদ্ভিদ-উপবিষ্ট স্থির পাণিকৌড়ির কৃষ্ণ রূপ; শ্মশান-শোভন একমাত্র বনবদরীর মসৃণ দেহের চারুরূপ; শ্মশান-বিন্যস্ত নরকঙ্কালের শুভ্র রূপ; বৃক্ষারূঢ়, চিন্তাশূন্য চিলদম্পতীর গম্ভীর সৌন্দর্য্য যুগপৎ হৃদয় ছাইয়া ফেলিল। পশ্চাতে অশ্বত্থশীর্ষে সেই রূপ, গোচরণভূমিতে সেই রূপ। এই রূপসাগরের মাঝে পড়িয়া আমার হৃদয়ের মেঘ সরিয়া গেল,—কোথায়ও আর তাহার ছায়ার চিহ্নও রহিল না। এখন আর গুমরিত বেদনা নাই। এই রূপের ইন্দ্রজালে চিরচঞ্চল মন বাসনা-কামনা-লেশশূন্য, সংস্কাররেখাহীন হইয়া এক্ষণে অব্যক্তরূপে চাঞ্চল্য-রহিত, স্বচ্ছ, শুভ্র। প্রাণপ্রবাহ এক্ষণে ধীরে, অতিধীরে প্রবহমান,—বহিতেছে কি স্থির হইয়াছে অনুভব করা কঠিন। ধীরে ধীরে ইষ্টদেবীর চরণ আসিয়া বুকের মাঝে তাহার শোভা ছড়াইতে ছড়াইতে স্থির হইল। মন সেই চরণ বেষ্টন করিয়া ধরিল। প্রাণ প্রবাহ আসিয়া চরণ-মনের নিম্নে মস্তক পাতিয়া দিল। বসিবার জন্য ভূমির প্রতি চাহিলাম। সর্ব্বত্রই শ্মশানের বড় বড় পিপীলিকা ফিরি-তেছে। আর শ্মশানপুষ্পের নবোদ্গত কচি কচ একরাত্রের জলেই মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। বসিলে কচ ভাঙ্গিয়া যাইবে,—এমন কচি প্রাণে ব্যথা লাগিবে, উপ-

বেশন করা হইল না। বনবদরীর শাখা ধরিয়া উত্তরাস্য হইয়া দাঁড়াইলাম। স্থির দেহ, স্থির প্রাণ, স্থির মন। হৃদয়ে চরণ, চরণে মন, মনে প্রাণ, প্রাণে প্রাণাধিক। জপে জপে জপ স্থির। রহিল শুধু শুদ্ধ, মুক্ত—কি ? কে ?

এই পার্ব্বত্য-প্রবাহিণী-পুলিনে, এই শ্মশান শোভার মাঝে এই স্থানে একখানি পর্ণকুটীর রচিত করিয়া তাহার মধ্যে অনুচ্চ বেদী নির্ম্মাণ করিয়া সেই বেদীতে পবিত্র আসন পাতিয়া উপবেশন করিলে এই অবস্থা কি চিরস্থির হয় ? যদি হয় তবে করি না কেন ? করিব না কি ? তোমার নিকট এই প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষাই ত করিতেছি। কিন্তু তুমি নীরব, নিস্তব্ধ—মুখে তোমার শব্দ নাই, শুধু নীরব, মধুর মাধুরী। মরি মরি কি মাধুরী !! এই মাধুরীই ত প্রাণ পাগল করিয়াছে। পাগল করিয়াছ ত পূর্ণ পাগল কর না কেন ? সে তোমারই ইচ্ছা। তুমিই এতদূরে এই শ্মশানে আনয়ন করিয়াছ। তুমিই ইচ্ছা করিলে এই শ্মশানের শব মাঝে শান্ত করিয়া রাখিতে পার। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর,—তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যদি কখনও স্থায়ী ভাবে এই সুখসম্পদের চির অধিকারী কর তাহা হইলে স্থায়ীভাবে এই সুখ ভোগ হইবে। আর যদি সে সম্পদের যোগ্য মনে না কর তবে

তাহাতেই বা কাতর হইব কেন? এই একদিনও ত তোমার সুখের লহরে ভাসাইলে। এই একদিনের সুখের তুলনায় জীবনব্যাপী অন্য সুখ ত অসুখ। আর যখন এই সুখের মুহূর্ত্ত সরিয়া যাইবে তখন? তখন কি? তখন কি একেবারেই সুখ শূন্য? কেন? কখনও নয়। এই সুখ-স্মৃতি! সে যে আমরণ দুঃখে সুখ। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কর—কোথা হইতে কোথায় আনিয়াছ, কোন্ অজ্ঞাত দেশের আস্বাদ ভোগ করাইতেছ, কর কর, আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কর।

জলে জলবিম্ব।

জ্যৈষ্ঠের দিবাবসানের প্রহরপূর্ব্ব হইতে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ষণের বেগ প্রবল ছিল না, অথচ বর্ষণের বিরামও ছিল না। সর্ব্বসন্তাপহারিণী জগজ্জননী ধীর ধারায় বারি সেচন করিয়া সন্তপ্তা তনয়ার দেহসন্তাপ শান্ত করিতেছিলেন। বর্ষার অদূরাগমনসূচক প্রথম বারি ফোঁটায় ফোঁটায় পতিত হইয়া ঈষৎ-শুষ্ক দূর্ব্বাদল অভি-ষিক্ত করত দূর্ব্বাদলনিম্নে ধরণীর সিকতা-বক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার বক্ষের জ্বালা জুড়াইতেছিল। প্রায় প্রহর-কাল এইরূপ ধীর, শান্ত বর্ষণের পর নীরবে ধীরে বর্ষণ বন্ধ হইয়া গেল। শীতল জলসেচনে কন্যার সন্তাপ অপ-নোদিত হইয়াছে মনে করিয়া ধরিত্রী-জননী যেন জলসেক বন্ধ করিলেন। দুহিতার শীতল দেহখানি আবৃত করিবার জন্য স্নেহস্বরূপিণী জগজ্জননী সন্ধ্যার কৃষ্ণাঞ্চল বিস্তৃত করিলেন। সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল। নিদাঘের দাবদাহ বিদূরিত হওয়ায় ধরণী ঘুমাইয়া পড়িল। সুনীল-গগনভালে শুক্লা সপ্তমীর অর্দ্ধচন্দ্র ফুটিয়া উঠিল। শশি-কলার অদূরে, চতুষ্পার্শ্বে স্নিগ্ধোজ্জ্বল তারকা ফুটিয়া উঠিল।

নির্ম্মাল্য।

নিম্নে শান্ত, সুপ্ত, শীতল পৃথিবী ; ঊর্দ্ধে শান্ত, সুপ্ত, শীতল নভোমণ্ডল। নিম্নে ধরণীবক্ষে মৃদুসমীরণ-সঞ্চালিত বেলায় পুষ্পের হাসি ; ঊর্দ্ধে নীলনভে স্থির, শান্ত, শীতল, মধুর চন্দ্রতারকায় জ্যোৎস্নার হাসি। শান্ত শীতল শোভার মাঝে উপবেশন করিয়া শান্ত শীতল শোভা প্রাণের প্রাণে ধরিতে ধরিতে প্রাণ শান্ত শীতল হইয়া গেল। আবেশে আরামে ধরণীর ন্যায় প্রাণ কখন ঘুমাইয়া পড়িল! সুপ্ত ধরা ; সুপ্ত প্রাণ,—মধুযামিনী!

* * *

প্রভাতে যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন রজনীতে যেন কাহার কোমল স্পর্শে প্রাণে বিশেষ আরাম আসিয়াছিল এমন অনুভব হইতে লাগিল। এমন চিন্তাশূন্য, শান্ত অবস্থা নিদ্রান্তে প্রতিপ্রভাতে ত ঘটে না। হৃদয়ের এই পবিত্র-ভাবে ভাসিতে ভাসিতে প্রফুল্লপ্রাণে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। প্রাতঃকৃত্যে এতাদৃশ বিমল আনন্দ প্রতি প্রভাতেই যদি ঘটিত! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহের আবরণ ত্যাগ করিয়া আবরণহীন গগনতলে আসি-লাম। দেখিলাম, ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববস্তু যে ভাবে ভরিত আমার অন্তরেও আজ সেই ভাবের স্থির লীলা।

* * *

জলে জলবিম্ব।

এ তুষারকিরীট হিমালয়ের রাজ্য। এ দেশে দিবসে উত্তাপ, নিশায় শীত। দেখিলাম, সজীব দুর্ব্বাদলে শুভ্র শিশির কণায় বালার্কের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণের রুচির হাসি। তখনই কেমন প্রাণের মধ্যে ধ্বনিয়া উঠিল "কতক্ষণ? অচিরেই ত এই শোভা ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালের ন্যায় মিশাইয়া যাইবে!" শিশির-শোভিত দুর্ব্বাদল হইতে নয়ন তুলিয়া অদূরে চাহিতে দেখিলাম, চূততরুমূলে শাখা-চ্যুত চূতফল। তখনই কেমন প্রাণের মধ্যে ধ্বনিয়া উঠিল "কাল যাহারা তরুশিরে সমীরণ সনে নাচিতেছিল আজ তাহারা বৃন্তচ্যুত হইয়া তরুতলে ধূলি-শয়নে!" আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখি বকুলতলে শুষ্কপত্র-শয়নে রাশি রাশি বকুল ফুল। তখনই কেমন প্রাণের মাঝে ধ্বনিয়া উঠিল "কাল যাহাদের সৌরভে আকুল হইয়া পাগল ভ্রমর ফুলে ফুলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রমোদভরে মধুর গুঞ্জন করিতেছিল আজ এখন তাহারা সিকতা-শয়নে। অচিরেই চলচরণচাপে ও খর-রবিকরতাপে শুকাইয়া যাইবে!" আরও অগ্রসর হইলাম। বিংশতি দিবস পূর্ব্বে যখন প্রথম এ প্রদেশে আসি তখন যে শস্য বিঘত-প্রমাণ ছিল আজ সেই শস্য আমার কটিদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র নবীন শস্যের শ্যামশোভায় শ্যামায়মান।

নির্ম্মাল্য।

শ্যামশস্যশিরে বালার্কের মধুর কিরণ। রমণীয় সুষমার রমণীয় ক্রীড়া! আবার মর্ম্মস্থল হইতে ধ্বনিয়া উঠিল "কিন্তু কতদিন!" "কিন্তু কতদিন?"—ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ধীর চরণে সম্মুখে চলিলাম। বিশাল-বপু, সুস্থ-শরীর কৃষক একপ্রকার নগ্নাবস্থায় আপন মনে বলদ চালনা করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে। ক্ষেত্রপার্শ্বে তাহার নিতান্ত-শিশু পুত্র প্রকাণ্ড-মহিষ-পৃষ্ঠে শয়ন করিয়া ঘাসের বুকে মাঠের পথে মহিষ চরাইতেছে। কি সুস্থ, সবল কৃষক! কি সরল, সহাস শিশু! কি প্রকাণ্ডদেহ মহিষ! "কিন্তু কত-দিন?" ধ্বনিয়া উঠিল হৃদয় মন্দিরে। এমন শান্ত প্রভাতে, এমন মনোরম শোভার মাঝে না চলিয়া কি থাকা যায়? সম্মুখে পার্ব্বত্য নদীর ক্ষীণ কলেবর। এখনও বর্ষা নামে নাই; নদীর এখন একপ্রকার শেষ দশা। "সকলেরই এই দশা চরম সময়"—ধ্বনিয়া উঠিল ধীরে। চতুর্দ্দিকে চাহিতে দেখিলাম নদীতীরে শ্মশান,—দূরব্যাপী শ্মশান। চিতার কৃষ্ণ কয়লা স্থানে স্থানে মৃত্যুর চিহ্ন ফুটাইয়া রাখি-য়াছে। কোথায়ও অর্দ্ধভগ্ন কলসী ঢলিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কোথায়ও অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড বালুকায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। চারিভিতে নরকঙ্কাল। একদিন যাহার জন্য মানুষ সকল সম্পদ্ ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই আজ সেই

জলে জলবিম্ব।

পরমপ্রিয় দেহের কি পরিণাম! শিরে শিরশোভা কেশরাশি নাই। নয়নে সেই মদনমোহন জ্যোতিঃ নাই,—শুধু ভীতিজনক দুইটি গহ্বর। বদনবিবরে কীট পতঙ্গ যথেচ্ছভাবে যাতায়াত করিতেছে। ঊর্দ্ধে, অধে, চতুর্দ্দিকে চাহিলাম। চাহিয়া চাহিয়া কতক্ষণ কাটাইলাম। মনে কখন এক নূতন অনুভব জাগিয়া উঠিয়াছে। মহিষপৃষ্ঠে শয়ান ঐ শিশুর ন্যায় আমি জন্মিয়াছি, ঐ বর্দ্ধমান শস্যের ন্যায় আমি বাড়িয়াছি, ঐ সমীরণ-সঞ্চালিত বকুলের ন্যায় আমিও দু'দিন নাচিয়াছি, বৃন্তচ্যুত ঐ চূতফলের ন্যায় আমিও ধরাশায়ী হইতে চলিয়াছি, অচিরেই এই শ্মশান-শায়িত নরমুণ্ডের ন্যায় আমিও কীট পতঙ্গের বিচরণ-ভূমি হইব, তাহার পর ধূলায় মিশিয়া যাইব। অনাদি, অনন্ত, দুর্ব্বোধ্য সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-সাগরে আমি তরঙ্গমাত্র,—উঠিয়াছি, ছুটিতেছি, এখনই মিলাইয়া যাইব। জলে বিম্ব উঠে, কিছুক্ষণ ভাসে, আবার তখনই ভাঙ্গে। আমিও সৃষ্টিস্থিতিলয়সাগরে বুদ্বুদ্‌মাত্র,—এই সলিলে উঠিয়াছি, এই সলিলে ভাসিতেছি, এখনই এই সলিলে ভাঙ্গিয়া পড়িব। এই বুঝি ভাঙ্গিলাম। বুদ্বুদের তবে অহঙ্কার কেন? বিম্বের তবে এত আয়োজন কেন? আয়োজন ছুটিল। অহঙ্কার টুটিল। সেই বিশাল প্রান্তরে অসংখ্য জলবিম্বের সহিত এই জলবিম্ব ভাসিয়া চলিল।

ভাসিতে ভাসিতে জলে জলবিম্ব মিশিল। সুখসাগর চিরদিন যেমন আপন সুখে বহিতেছে তেমনই বহিয়া চলিল।

"তাহার পর?"

"তাহার পর? কেন?—সে কথায় কাজ কি?"

সমাপ্ত।

ভাই ও ভগিনী।

উপন্যাস।

শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

—:*:—

সর্ব্বসন্তাপহারিণী শান্তিদেবীর প্রিয় লীলাভূমি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই আজ অশান্তির কৃষ্ণচ্ছায়া পরিদৃষ্ট হইতেছে। আজ অতীত-আনন্দ-ভবন ভারতের ভবনে সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই। যাহা সে দিন ছিল আজ তাহা নাই কেন? যাহা ছিল তাহা গেল কেন? যাহা গিয়াছে তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারা যায় কি না? ভারতের এই লুপ্ত সম্পদের পুনরুদ্ধার কে করিতে পারে? এই সকল জটিল প্রশ্নের সমাধান ভারতের যুবক যুবতীকেই করিতে হইবে। এই সকল গুরুতর সমস্যার সমাধান করিবার জন্য ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে আজ ভারতের যুবক যুবতী অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে ভাগ্যবান্ যুবক এবং যে ভাগ্যবতী যুবতী এই গৌরবের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন তাঁহাকে প্রাচীন ভারতের ঋষিকুমার ও ঋষিকন্যার ন্যায় পূতচরিত্র হইতে হইবে। কি ভাবে লালসা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সংযমের মূল ছিন্ন করিতে পারে, কি উপায়েই বা এই মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ

লাভ করিতে পারা যায়—এই সকল আলোচনার এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। "ভাই ও ভগিনী"—নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসের লেখক বঙ্গের যুবক যুবতীর সম্মুখে এই বিশাল বিষয়ের একটি অংশের আলোচনা উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই ভোগেচ্ছা প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু শ্রীভগবানের আজ্ঞা "তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" এখানে সংযত হইতেই বলিতেছেন। গ্রন্থকার উপন্যাসচ্ছলে ইহারই সুন্দর ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাব সম্পদে ও ভাষা গৌরবে "ভাই ও ভগিনী" উপন্যাস-উদ্যানের একটি শ্রেষ্ঠ কুসুম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পুস্তক পাঠে বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা—সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন। সুন্দর এ্যান্টিক কাগজে ছাপা। ৯০ পৃষ্ঠায় বাঁধাই। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। প্রকাশকের নিকট এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়। বঙ্গের আশাভরসাস্থল, আমাদের বঙ্গযুবকযুবতী-গণকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি।

প্রকাশক—শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

"গীতা" ও "উৎসব" প্রকাশক।

"উৎসব" কার্য্যালয়—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

